يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ۭ قَالُوْا لَا عِلْمَ
لَنَا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١٠٩﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰي وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ
الْقُدُسِ ۭ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ
كَهَيْــَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِيْ وَ
تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ
وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٠﴾ وَ
اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْٓا
اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١١﴾ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ
يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ
عَلَيْنَا مَاۗىِٕدَةً مِّنَ السَّمَاۗءِ ۭ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَىِٕنَّ قُلُوْبُنَا
وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾

(১০৯) যেদিন আল্লাহ্ সব পয়গম্বরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেন ঃ আমরা অবগত নই; আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (১১০) যখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে, ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বলল ঃ এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়।

(১১১) আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আনুগত্যশীল। (১১২) যখন হাওয়ারীরা বলল ঃ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা, আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্কে ভয় কর। (১১৩) তারা বলল ঃ আমরা তা থেকে খেতে চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে, আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কেয়ামতে পয়গম্বরগণকে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে ঃ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ কিয়ামতে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একটি উন্মুক্ত মাঠে উপস্থিত হবে। যে কোন অঞ্চলের, যে কোন দেশের এবং যে কোন সময়ের মানুষই হোক না কেন, সবাই সে সুবিশাল ময়দানে উপস্থিত হবে এবং সবার কাছ থেকে তাদের সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে। কিন্তু আয়াতে বিশেষভাবে নবী-রসূলগণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ অর্থাৎ, ঐ দিনটি বাস্তবিকই স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্ তাআলা সব পয়গম্বরকে হিসাবের জন্যে একত্রিত করবেন। উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত সবাইকে করা হবে, কিন্তু সর্ব প্রথম প্রশ্ন নবী-রসূলগণকেই করা হবে যাতে সমগ্র সৃষ্টজগত দেখতে পায় যে, আজ হিসাব ও প্রশ্ন থেকে কেউ বাদ পড়বে না। পয়গম্বরগণকে যে প্রশ্ন করা হবে, তা এই ঃ مَاذَآ اُجِبْتُمْ অর্থাৎ, তোমরা যখন নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর সত্য ধর্মের দিকে আহবান করেছিলে, তখন তারা তোমাদেরকে কি উত্তর দিয়েছিল? তারা তোমাদের বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করেছিল, না অস্বীকার ও বিরোধিতা করেছিল?

এ প্রশ্নটি যদিও আম্বিয়া (আঃ)-কে করা হবে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে তাঁদের উম্মতকে শুনানো। অর্থাৎ, উম্মতরা যেসব সৎকর্ম ও কুকর্ম করেছে, তার সাক্ষ্য সর্ব প্রথম তাদের পয়গম্বরদের কাছ থেকে নেয়া হবে। উম্মতের জন্যেও মুহূর্তটি হবে অত্যন্ত নাজুক। কারণ, তারা এ হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিতে যখন নিজেদের নবী-রসূলগণের সুপারিশ আশা করবে, তখনই স্বয়ং নবী-রসূলগণের কাছে তাদের সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, আম্বিয়াগণ কোন ভ্রান্ত ও বাস্তব বিরোধী কথা বলতে পারবেন না। তাই গোনাহ্গার ও অপরাধীরা আশঙ্কা করবে যে, যখন স্বয়ং নবীগণই আমাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্যদাতা তখন আর কে আমাদের সুপারিশ ও সাহায্য করবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলবেন ঃ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ অর্থাৎ, তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আপনিই স্বয়ং যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

একটি সন্দেহের নিরসন ঃ এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের ওফাতের পর তাঁর যে উম্মত জন্মগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে পয়গম্বরগণের এ উত্তর নির্ভুল ও সুস্পষ্ট। কেননা, অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া কারও জানা নেই। কিন্তু বিরাট সংখ্যক উম্মত এমনও তো রয়েছে, যারা স্বয়ং পয়গম্বরগণের অক্লান্ত চেষ্টায় এ তাঁদের হাতেই মুসলমান হয় এবং তাঁদের সামনেই বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করে। এমনিভাবে যেসব কাফের পয়গম্বরগণের আদেশের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে, তাদের সম্পর্কে একথা বলা কিভাবে নির্ভুল হতে পারে যে, তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই? তফসীর বাহরে-মুহীতে ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ রাযী এর উত্তরে বলেন ঃ এখানে পৃথক পৃথক দু'টি বিষয় রয়েছে ঃ (এক) এলম, যার অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস, (দুই) প্রবল ধারণা। একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সামনে থাকা সত্ত্বেও তার ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিতে পারে, পূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কেননা, অন্তরের ভেদ ও সত্যিকার ঈমান সম্পর্কে কেউ ওহী ব্যতীত নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। কারণ, ঈমানের সম্পর্ক হল অন্তরের সাথে। প্রত্যেক উম্মতেই কপট বিশ্বাসী মুনাফেকদেরও একটি দল ছিল। তারা বাহ্যতঃ ঈমানও আনত এবং নির্দেশাবলীও পালন করত,

কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না এবং নির্দেশাবলী অনুসরণের আন্তরিক কোন প্রেরণাও ছিল না। তাদের মধ্যে যা কিছু ছিল, সবই ছিল লোক দেখানো। তবে বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের উপরই জাগতিক বিচার নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, খোদায়ী নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এবং ইসলাম ও ঈমান বিরোধী কোন কথা ও কর্মে জড়িত হয় না, নবী-রসূলগণ তাকে 'ঈমানদার ও সৎকর্মী' বলতে বাধ্য ছিলেন; সে অন্তরে খাঁটি ঈমানদার কিংবা মুনাফেক যাই হোক। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

অর্থাৎ, আমরা তো বাহ্যিক কাজকর্ম দেখে বিচার করি। অন্তর্নিহিত গোপনভেদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তাআলা।

এ বিধান অনুযায়ী দুনিয়াতে আম্বিয়া (আঃ) ও তাঁদের উত্তরাধিকারী আলেমসমাজ বাহ্যিক কাজকর্মের ভিত্তিতে কারও ঈমানদার সৎকর্মী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারতেন। কিন্তু আজ সে দুনিয়া ও দুনিয়ার রীতি-নীতি শেষ হয়ে গেছে। আজ হাশরের ময়দান। এখানে চুলচেরা তথ্য উদঘাটিত হবে এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রথমে অন্যদের সাক্ষ্য নেয়া হবে। যদি অপরাধী এতে নিশ্চিত না হয় এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকার না করে, তবে বিশেষ ধরনের সরকারী সাক্ষী উপস্থিত করা হবে। অপরাধীদের মুখে ও জিহবায় সীল মেরে দেয়া হবে এবং তাদের হস্ত,পদ ও চামড়ার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এরা প্রত্যেক কাজের পূর্ণ স্বরূপ তুলে ধরবে।—

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ, অদ্য আমি তাদের মুখে সীল মেরে দিব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তখন মানুষ জানতে পারবে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিল রাব্বুল-আলামীনের গুপ্ত পুলিশ। এদের বর্ণনার পর অস্বীকার করার কোন উপায়ই থাকবে না।

মোটকথা, পরজগতে শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কোন কিছুর বিচার করা হবে না বরং অকাট্য জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সবকিছুর বিচার হবে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কারও ঈমান ও কর্মের সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া কারও নেই। তাই হাশরের ময়দানে যখন নবী-রসূলগণকে প্রশ্ন করা হবে مَاذَا أُجِبْتُمْ তখন তাঁরা এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলবেন যে, এ প্রশ্ন ইহজগতে হচ্ছে না যে, ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে জওয়াব দিলেই চলবে, বরং এ প্রশ্ন হচ্ছে হাশরের ময়দানে, যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোন কিছু বলা যাবে না। তাই তাঁদের এ উত্তর যথার্থ ও সঙ্গত যে, এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর-পয়গম্বরগণের চূড়ান্ত দয়ার্দ্রতা প্রকাশ ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, উম্মতের গ্রহণ করা ও গ্রহণ না করা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার যেসব ঘটনা তাঁদের সামনে সংঘটিত হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে প্রবল ধারণাপ্রসূত যে জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছিলেন, উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে অন্ততঃ তা বর্ণনা করা উচিত ছিল। এ জ্ঞানটি নিশ্চিত কি না, শুধু এ বিষয়টিই আল্লাহ্র জ্ঞানে সমর্পন করলে চলত। কিন্তু এখানে নবী-রসূলগণ নিজস্ব জ্ঞান ও সংঘটিত ঘটনাবলী একেবারেই উল্লেখ করেননি। সবকিছু আল্লাহ্র জ্ঞানের উপর সমর্পন করে তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন।

এর তাৎপর্য এই যে, নবী-রসূলগণ নিজ নিজ উম্মত ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। তাঁদের সম্পর্কে এমন কোন কথাই উচ্চারণ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক, যার ফলে তাঁরা বিপদের সম্মুখীন হয়। তবে নিরুপায় হলে অবশ্যই বলতে হত। এখানে অকাট্য জ্ঞান না থাকার অজুহাত ছিল। এ অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে মুখে উম্মতের বিরুদ্ধে কিছু বলা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন এবং সেমতে তাঁরা তাই করে আত্মরক্ষা করেছেন।

হাশরে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন ঃ সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের একটি ঝলক সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হিসাব-নিকাসের কাঠগড়ায় আল্লাহ্ তাআলার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় রসূলগণ কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন। সুতরাং অন্যদের যে কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই এখন থেকেই সে ভয়াবহ দিনের চিন্তা করা উচিত এবং জীবনকে এ হিসাব-নিকাস প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করা কর্তব্য।

তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

"হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তির পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নেয়া হয়। প্রথম এই যে, সে জীবনের সুদীর্ঘ ও প্রচুর সংখ্যক দিবারাত্রকে কি কাজে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় এই যে, বিশেষভাবে কর্মক্ষম যৌবনকালকে সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তৃতীয় এই যে, সে অর্থকড়ি কোন (হালাল কিংবা হারাম) পথে উপার্জন করেছে? চতুর্থ এই যে, অর্থকড়িতে সে কোন (জায়েয কিংবা নাজায়েয) কাজে ব্যয় করেছে? পঞ্চম এই যে, নিজ এলম্ অনুযায়ী সে কি আমল করেছে?

আল্লাহ্ তাআলা চূড়ান্ত অনুগ্রহ ও দয়া বশতঃ এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমে উম্মতের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এখন এসব প্রশ্নের সমাধান শিক্ষা করাই উম্মতের কাজ। পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র প্রকাশ করে দেয়ার পরও যদি কেউ ফেল করে, তবে এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে বিশেষ প্রশ্নোত্তর ঃ প্রথম আয়াতে সমগ্র পয়গম্বরগণের অবস্থা ও তাঁদের সাথে প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এবং এর পরবর্তী নয় আয়াতে (সূরার শেষ পর্যন্ত) বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের শেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে আলোচনা ও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কিছু বিবরণ দেয়া হয়েছে। হাশরে তাঁকে একটি বিশেষ প্রশ্ন ও তার উত্তর পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

এ প্রশ্নোত্তরের সারমর্ম ও বনী-ইসরাঈল তথা সমগ্র মানব জাতির সামনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা। এ ময়দানে রূহুল্লাহ্ ও কলেমাতুল্লাহ্ অর্থাৎ, ঈসা (আঃ)-কেও প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার উম্মত তোমাকে আল্লাহ্র অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। হযরত ঈসা স্বীয় সম্মান, মাহাত্ম্য, নিষ্পাপতা ও নবুওয়ত সত্ত্বেও অস্থির হয়ে আল্লাহ্র দরবারে সাফাই পেশ করবেন। একবার নয়, বার বার বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করবেন যে, তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দেননি। প্রথমে বলবেন ঃ

سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ

অর্থাৎ, আপনি পবিত্র, আমার কি সাধ্য ছিল যে, আমি এমন কথা বলব, যা বলার অধিকার আমার নেই?

স্বীয় সাফাইয়ের দ্বিতীয় ভঙ্গি এই যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাকে

সাক্ষী করে বলবেন ঃ যদি আমি এরূপ বলতাম, তবে অবশ্যই আপনার তা জানা থাকত। কেননা, আপনি তো আমার অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কেও অবগত। কথা ও কর্মেরই কেন, আপনি তো 'আল্লামুল-গুয়ুব', দ্বিতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

এ দীর্ঘ ভূমিকার পর হযরত ঈসা (আঃ) প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

হযরত ঈসার উত্তর ঃ আমি তাদেরকে ঐ শিক্ষাই দিয়েছি, যার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দাসত্ব অবলম্বন কর, যিনি আমার ও তোমাদের সকলের পালনকর্তা। এ শিক্ষার পর আমি যত দিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সাক্ষী ছিলাম, (তখন পর্যন্ত তাদের কেউ এরূপ কথা বলত না –) এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নেন, তখন তারা আপনার দেখাশোনার মধ্যেই ছিল। আপনিই তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহের বর্ণনা ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ঈসা (আঃ)–এর সাথে যে প্রশ্নোত্তরের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার পূর্বে ঐসব অনুগ্রহের বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে, যা বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আঃ)–কে মো'জেযার আকারে দেয়া হয়। এতে একদিকে বিশেষ অনুগ্রহ ও অপরদিকে জবাবদিহির দৃশ্যের অবতারণা করে বনী-ইসরাঈলের ঐ জাতিদ্বয়কে হুশিয়ার করা হয়েছে, যাদের এক জাতি তাঁকে অপমানিত করে এবং নানা অপবাদ আরোপ করে কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি 'খোদা' কিংবা 'খোদার পুত্র' আখ্যা দেয়। অনুগ্রহ উল্লেখ করে প্রথম জাতিকে এবং প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করে শেষোক্ত জাতিকে হুশিয়ার করা হয়েছে। এখানে যেসব অনুগ্রহ কয়েকটি আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি বাক্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে ঃ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا অর্থাৎ, হযরত ঈসা (আঃ)–কে দেয়া একটি বিশেষ মো'জেযা এই যে,তিনি মানুষের সাথে শিশু অবস্থায়ও কথা বলেন এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন।

এখানে প্রথমোক্ত বিষয়টি যে, মো'জেযা ও বিশেষ অনুগ্রহ, তা বলাই বাহুল্য। জন্মগ্রহণের প্রথম দিকে শিশু কথা বলতে পারে না। কোন শিশু মায়ের কোলে কিংবা দোলনায় কথাবার্তা বললে, তা তার বিশেষ স্বাতন্ত্র্যরূপে গণ্য হবে। পরিণত বয়সে কথা বলা, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রত্যেক মানুষই এ বয়সে কথা বলে থাকে। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)–এর বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এটিও একটি মো'জেযা। কেননা, পরিণত বয়সে পৌঁছার পূর্বেই ঈসা (আঃ)–কে ইহজগত থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এখন এ জগতের মানুষের সাথে পরিণত বয়সে কথা বলা তখনই হতে পারে, যখন দ্বিতীয় বার তিনি এ জগতে পদার্পণ করবেন। মুসলমানদের সর্বসম্মত বিশ্বাস তাই এবং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বর্ণনা থেকেও একথাই প্রমাণিত। অতএব, বোঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আঃ)–এর শিশু অবস্থায় কথা বলা যেমন মো'জেযা, তেমনি পরিণত বয়সে কথা বলাও একটি মো'জেযা। কারণ, তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে পদার্পন করবেন।

মো'জেযা দাবী করা মুমিনের পক্ষে অনুচিত ঃ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ যখন হাওয়ারীরা ঈসা (আঃ)–এর কাছে আকাশ থেকে খাদ্যাধার অবতারণ দাবী করল, তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এতে বুঝা যায় যে, ঈমানদার বান্দার পক্ষে এ ধরনের ফরমায়েশ করে আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করা কিংবা তাঁর কাছে অলৌকিক বিষয় দাবী করা একান্ত অনুচিত। বরং ঈমানদার বান্দার পক্ষে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথে রুযী ইত্যাদি অন্বেষণ করাই কর্তব্য।

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ
تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ
خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ
مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي
وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ
مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي
وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ
إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ
وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ
تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ
الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾
لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

(১১৪) ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন ঃ হে আল্লাহ্, আমাদের পালনকর্তা। আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। (১১৫) আল্লাহ্ বললেন ঃ নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না। (১১৬) যখন আল্লাহ্ বললেন ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম। তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহ্কে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। (১১৭) আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব অবলম্বন কর— যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। (১১৮) যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। (১১৯) আল্লাহ্ বললেন ঃ আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা। (১২০) নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নেয়ামত অসাধারণ বড় হলে অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও বড় হয়ঃ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, নেয়ামত অসাধারণ ও অনন্য হলে তার কৃতজ্ঞতার তাকিদও অসাধারণ হওয়া দরকার এবং অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও অসাধারণ হওয়াই স্বাভাবিক।

মায়েদা তথা খাদ্যাধার আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল কি না, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেন ঃ অবতীর্ণ হয়েছিল। তিরমিযীর হাদীসে আম্মার ইবনে ইয়াসির থেকে বর্ণিত আছে যে, খাদ্যাধার আকাশ থেকে নাযিল হয়েছিল এবং তাতে রুটি ও গোশ্ত ছিল। এ হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ, তাদের কিছু সংখ্যক) বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল এবং পরবর্তী দিনের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। (نعوذ بالله من غضب الله)

এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, তারা তা ভক্ষণও করেছিল। আয়াতের نأكل শব্দে এ তথ্যও বিবৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ের জন্যে সঞ্চয় করে রাখা নিষিদ্ধ ছিল।— (বয়ানুল-কোরআন)

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى আল্লাহ্ তাআলা সবকিছু জানেন। সুতরাং অজানাকে জানার জন্যে ঈসা (আঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য খ্রীষ্টান জাতিকে তিরস্কার করা ও ধিক্কার দেয়া যে, যাকে তোমরা উপাস্য মনে করছ সে স্বয়ং তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীতে স্বীয় দাসত্ব স্বীকার করছে এবং তোমাদের অপবাদ থেকে সে মুক্ত।— (ইবনে-কাছীর)

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু অথবা আকাশে উত্থিত করা ইত্যাদি বিষয়ে সূরা-আলে-এমরানের إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي বাক্যটিকে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর দলীল ও আকাশে উত্থিত হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা ঠিক নয়। কেননা, এ কথোপকথন কিয়ামতের দিন হবে। তখন আকাশ থেকে অবতরণের পর তাঁর সত্যিকার মৃত্যু হবে অতীত বিষয়। ইবনে-কাসীর আবু-মূসা আশআরীর রেওয়ায়েত ক্রমে এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন নবী-রসূলগণকে ও তাঁদের উম্মতকে ডাকা হবে। অতঃপর ঈসা (আঃ)-কে ডাকা হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে স্বীয় নেয়ামতের কথা স্মরণ করাবেন এবং নিকটে এনে বলবেন ঃ হে মরিয়ম তনয় ঈসা, اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমি যে সমস্ত নেয়ামত দান করেছিলাম তা স্মরণ কর। অবশেষে বলবেন ঃ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ হে ঈসা, তুমি কি লোকদেরকে এমন কথা বলেছ যে, আমাকে ও আমার মাতাকে আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্যরূপে গ্রহণ কর? ঈসা বলবেন ঃ পরওয়ারদেগার, আমি এরূপ বলিনি। এরপর খ্রীষ্টানদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তারা বলবে ঃ হাঁ, তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছিলেন। এরপর খ্রীষ্টানদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে দেয়া হবে।

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ অর্থাৎ, আপনি বান্দাদের প্রতি জুলুম ও

অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। তাই তাদেরকে শাস্তি দিলে তা ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞতা-ভিত্তিকই হবে। অগত্যা যদি ক্ষমা করে দেন, তবে এ ক্ষমাও অক্ষমতাপ্রসূত হবে না। কেননা, আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রবল। তাই কোন অপরাধী আপনার শক্তির নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। যেহেতু আপনি সুবিজ্ঞ, তাই এটাও সম্ভব নয় যে, অপরাধীকে বিনা বিচারেই ছেড়ে দেবেন। মোটকথা, অপরাধীদের ব্যাপারে আপনি যে রায়ই দেবেন, তাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞজনোচিত ও সক্ষমতাসুলভ হবে। হযরত ঈসা (আঃ) হাশরের ময়দানে এসব কথা বলবেন। সেখানে কাফেরদের পক্ষে কোনরূপ সুপারিশ, দয়া ভিক্ষা ইত্যাদি চলবে না। তাই তিনি عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ এর পরিবর্তে غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ অবলম্বন করেননি। এর বিপরীতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দুনিয়াতে পরওয়ারদেগারের দরবারে আরয করেছিলেন ঃ

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হে পরওয়ারদেগার, এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের মধ্যে যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার লোক এবং যে আমার অবাধ্যতা করে, তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ, এখনও সময় আছে; তুমি স্বীয় রহমতে ভবিষ্যতে তাদেরকে তওবা ও সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনের শক্তি দান করে অতীত গোনাহ্ ক্ষমা করতে পার।— (কাওয়ায়েদে-ওসমানী)

ইবনে-কাসীর হযরত আবু যরের (রাঃ) বাচনিক বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) একবার সারা রাত্রি اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ আয়াতখানিই পাঠ করতে থাকেন। ভোর হলে আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসুলাল্লাহ্, আপনি এ আয়াতটিই পাঠ করতে করতে ভোর করেছেন। এ আয়াত দ্বারাই রুকূ করেছেন এবং এ আয়াত দ্বারাই সেজদা করেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি পরওয়ারদেগারের কাছে নিজের জন্যে শাফায়াতের আবেদন করেছি। আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। অতি সত্বরই আমি তা লাভ করব। আমি এমন ব্যক্তির জন্যে শাফায়াত করতে পারব, যে আল্লাহ্ তাআলার সাথে কোন অংশীদার করেনি।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মহানবী (সাঃ) উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে আকাশের দিকে হস্ত প্রসারিত করেন এবং বলেন ঃ اللهم امتى অর্থাৎ, হে পাক পরওয়ারদেগার, আমার উম্মতের প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও। অতঃপর তিনি কাঁদতে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলের মাধ্যমে এভাবে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জিবরাঈলকে উপরোক্ত উক্তি শুনিয়ে দেন। আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলকে বললেন ঃ তা হলে যাও এবং (হযরত) মুহম্মদ (সাঃ)-কে বলে দাও যে, আমি অতিসত্বর আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব— অসন্তুষ্ট করব না।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ — সাধারণভাবে বাস্তবসম্মত উক্তিকে 'সিদক' তথা সত্য এবং বাস্তব বিরুদ্ধ উক্তিকে 'কিয্ব' তথা মিথ্যা মনে করা হয়। কিন্তু কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে জানা যায় যে, সত্য ও মিথ্যা শুধু উক্তিই নয়, কর্মও হতে পারে। নিম্নোক্ত হাদীসে বাস্তব বিরোধী কর্মকে মিথ্যা বলা হয়েছে ঃ

من تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوب زور — 'অর্থাৎ, কেউ যদি এমন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, যা তাকে দেয়া হয়নি, অর্থাৎ, এমন কোন গুণ বা কর্ম দাবী করে, যা তার মধ্যে নেই, তবে সে যেন মিথ্যার বস্ত্র পরিধান করে।'

অন্য এক হাদীসে প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তমরূপে নামায আদায়কারীকে সত্য বান্দা বলা হয়েছে ঃ

যে ব্যক্তি জনসমক্ষে উত্তমরূপে নামায পড়ে এবং নির্জনতায়ও এমনিভাবে নামায পড়ে, তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ সে আমার সত্যিকার বান্দা।– (মেশকাত)

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ জান্নাত পাওয়ার পর আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ বড় নেয়ামত এই যে, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট; এখন থেকে কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ — অর্থাৎ, এটিই মহান সফলতা। স্রষ্টা ও পরম প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে গেলে এর চাইতে বৃহত্তর সফলতা আর কি হতে পারে?

।। সূরা মায়েদাহ সমাপ্ত ।।

سُوْرَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّخَمْسٌ وَّسِتُّوْنَ اٰيَةً وَّعِشْرُوْنَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ
وَالنُّوْرَ ۬ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِيْ
خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ
تَمْتَرُوْنَ ﴿٢﴾ وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ
جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ﴿٣﴾ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ
رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ
فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٥﴾ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ
اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ
وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٦﴾
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾ وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ
عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ﴿٨﴾

সূরা আল্‌-আন-আম
(মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১৬৫)

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি।

(১) সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তথাপি কাফেররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে। (২) তিনিই তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহ্‌র কাছে আছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর। (৩) তিনিই আল্লাহ্‌ নভোমণ্ডলে এবং ভূমণ্ডলে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা কর তাও অবগত (৪) তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের নির্দর্শনাবলী থেকে কোন নিদর্শন আসেনি; যার প্রতি তারা বিমুখ হয় না। (৫) অতএব, অবশ্য তারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছে। বস্তুতঃ অচিরেই তাদের কাছে ঐ বিষয়ের সংবাদ আসবে, যার সাথে তারা উপহাস করত। (৬) তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি। আমি আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি এবং তাদের তলদেশে নদী সৃষ্টি করে দিয়েছি, অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। (৭) যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম, অতঃপর তারা তা সহস্তে স্পর্শ করত, তবুও অবিশ্বাসীরা একথাই বলত যে, এটা প্রকাশ্য জাদু বৈ কিছু নয়। (৮) তারা আরও বলে যে, তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হল না? যদি আমি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যেত। অতঃপর তাদেরকে সামান্যও অবকাশ দেওয়া হত না।

সূরা আল্‌-আন-আম
আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সূরা আন'আমের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েকখানি আয়াত বাদে গোটা সূরাটিই একযোগে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সত্তর হাজার ফেরেশতা তসবীহ্ পাঠ করতে করতে এ সূরার সাথে অবতরণ করেছিলেন। তফসীরবিদগণের মধ্যে মুজাহিদ, কলবী, কাতাদাহ প্রমুখও প্রায় একথাই বলেন।

আবু ইসহাক ইসকেরায়িনী বলেন ঃ এ সূরাটিতে তওহীদের সমস্ত মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরাটিকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বাক্য দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। এতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে। এ খবরের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া এবং এ বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাদানের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি কারও হাম্‌দ বা প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন। কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক, তিনি স্বীয় ওজুদ বা সত্তার পরাকাষ্ঠার দিক দিয়ে নিজেই প্রশংসনীয়। এ বাক্যের পর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসনীয় হওয়ার প্রমাণও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে সত্তা এ হেন মহান শক্তি-সামর্থ্য ও বিজ্ঞবান বাহক, তিনিই হাম্‌দ ও প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন।

এ আয়াতে سماوات শব্দটিকে বহুবচনে এবং ارض শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অন্য এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নভোমণ্ডলের ন্যায় ভূমণ্ডলও সাতটি। সম্ভবতঃ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সপ্ত আকাশ আকার-আকৃতি ও অন্যান্য অবস্থার দিক দিয়ে একটি অপরটি থেকে অনেক স্বতন্ত্র, কিন্তু সপ্ত পৃথিবী পরস্পর সমআকৃতি বিশিষ্ট; তাই এগুলোকে এক গণ্য করা হয়েছে।-(মাযহারী)

এমনিভাবে ظلمات শব্দটিকে বহুবচনে এবং نور শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نور বলে বিশুদ্ধ সরল পথ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা মাত্র একটিই। আর ظلمات বলে ভ্রান্ত পথ ব্যক্ত করা হয়েছে, যা অসংখ্য।-(মাযহারী ও বাহ্‌রে-মুহীত)

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল নির্মাণ করাকে خلق শব্দ দ্বারা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করাকে جعل শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্ধকার ও আলো নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডের মত স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর বস্তু নয়, বরং পরনির্ভর আনুষঙ্গিক ও গুণবাচক বিষয়। অন্ধকারকে আলোর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এ জগতে অন্ধকার হল আসল এবং আলো বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাথে জড়িত। সেসব বস্তু সামনে থাকলে আলোর উদ্ভব হয়, না থাকলে সবকিছু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করে জগতের ঐসব জাতিকে হুশিয়ার করা, যারা মূলতঃ একত্ববাদের বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও একত্ববাদের তাৎপর্যকে পরিত্যাগ করে বসেছে।

অগ্নি উপাসকদের মতে জগতের স্রষ্টা দু'জন-ইয়ায্‌দান ও আহ্‌রামান। তারা ইয়ায্‌দানকে মঙ্গলের স্রষ্টা এবং আহ্‌রামানকে অমঙ্গলের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে। এ দুটিকেই তারা অন্ধকার ও আলো বলে ব্যক্ত করে।

ভারতের পৌত্তলিকদের মতে তেত্রিশ কোটি দেবতা খোদার অংশীদার। আর্য সমাজ একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আত্মা ও মূল

পদার্থকে অনাদি এবং খোদার শক্তি-সামর্থ্য ও সৃষ্টি থেকে মুক্ত সাব্যস্ত করে একত্ববাদের মূল স্বরূপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। এমনিভাবে খ্রীষ্টানরা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাতাকে আল্লাহ্ তাআলার অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্ববাদের বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্যে তারা 'একে তিন' এবং 'তিনে এক' এর অযৌক্তিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে। আরবের মুশরেকরা তো খোদায়ী কল্পনে চূড়ান্ত বদান্যতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ের প্রতিটি বড় পাথরও তাদের মতে মানবজাতির উপাস্য হতে পারত। মোটকথা, যে মানবকে আল্লাহ্ তাআলা' আশরাফুল-মখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা করেছিলেন, তারা যখন পথভ্রষ্ট হল, তখন চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, আকাশ, পানি, বৃক্ষলতা, এমনকি, পোকা-মাকড়কেও সেজদার যোগ্য উপাস্য রুযীদাতা ও বিপদ বিদূরণকারী সাব্যস্ত করে নিল।

কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলাকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবক বলে উপরোক্ত সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করেছে। কেননা, অন্ধকার ও আলো, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্ট। অতএব, এগুলোকে কেমন করে আল্লাহ্ তাআলার অংশীদার করা যায়?

প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তম বস্তুগুলোকে আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল একত্ববাদ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ। যদি এরই সূচনা, পরিণতি ও বাসস্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে একত্ববাদ একটা বাস্তব সত্য হয়ে সামনে ফুটে উঠবে। এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا - অর্থাৎ, আল্লাহ্-তাআলাই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ)-কে একটি বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই আদম-সন্তানরা বর্ণ, আকার এবং চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লালবর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ পবিত্র-স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র-স্বভাবের হয়ে থাকে। - (মাযহারী)

এই হচ্ছে মানব সৃষ্টির সূচনা। এরপর পরিণতির দু'টি মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ও তার উপকারে নিয়োজিত সৃষ্টজগত-সবার সমষ্টির পরিণতি, যাকে কেয়ামত বলা হয়। মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি বুঝাবার জন্যে বলা হয়েছেঃ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا —অর্থাৎ, মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তাআলা তার স্থায়িত্ব ও আয়ুষ্কালের জন্যে একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার নাম মৃত্যু। এ মেয়াদ মানবের জানা না থাকলেও আল্লাহ্র ফেরেশতারা জানেন, বরং এ দিক দিয়ে মানুষও মৃত্যু সম্পর্কে অবগত। কেননা, সে সর্বদা, সর্বত্র আশ-পাশে আদম-সন্তানদেরকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে।

এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ, কেয়ামতের উল্লেখ করা বলা হয়েছেঃ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ —অর্থাৎ, আরও একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। এ মেয়াদের পূর্ণ জ্ঞান ফেরেশতাদের নেই এবং মানুষেরও নেই। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ, গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক সৃষ্টি ও নির্মিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ, মানুষ যে আল্লাহ্র সৃষ্টজীব, তা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানুষকে শৈথিল্য থেকে জাগ্রত করার জন্যে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আয়ুষ্কাল রয়েছে, যার পর তার মৃত্যু অবধারিত। প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশ-পাশে প্রত্যক্ষ করে। وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক মৃত্যু অর্থাৎ, কেয়ামতকে সপ্রমাণ করা একটা মনস্তাত্ত্বিক ও স্বাভাবিক বিষয়। তাই কেয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণে আয়াতের শেষভাবে উপযুক্ততা প্রকাশার্থে বলা হয়েছে ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ - অর্থাৎ, এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও তোমরা কেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর! এটা অনুচিত।

তৃতীয় আয়াতে প্রথম দু'আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলাই এমন এক সত্তা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে এবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য এবং তিনিই তোমাদের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা এবং প্রতিটি উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি পরিজ্ঞাত।

চতুর্থ আয়াতে অমনোযোগী মানুষের হঠকারিতা ও সত্য বিরোধী জেদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের হেদায়েতের জন্যে যে-কোন নিদর্শন প্রেরণ করা হয়, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়— এ সম্পর্কে মোটেই চিন্তা-ভাবনা করে না।

পঞ্চম আয়াতে কতক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে এ অমনোযোগিতার আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ —অর্থাৎ, সত্য যখন তাদের সামনে প্রতিভাত হল, তখন তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এখানে 'সত্যের' অর্থ কোরআন হতে পারে এবং নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র ব্যক্তিত্বও হতে পারে।

কেননা, মহানবী (সাঃ) আজীবন আরব গোত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থান করেন। তাঁর শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা একথাও পুরোপুরিই জানত যে, মহানবী (সাঃ) কোন মানুষের কাছে এক অক্ষরও শিক্ষালাভ করেননি। এমন কি তিনি নিজ হাতে নিজের নামও লিখতে পারতেন না। সারা আরবে তিনি উম্মি (নিরক্ষর) উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেতেই অকস্মাৎ তাঁর মুখ দিয়ে নিগুঢ়তত্ত্ব, আধ্যাত্মবিদ্যা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল, যা জগতের পারদর্শী দার্শনিকদেরকেও বিস্ময়াভিভূত করে দেয়। তিনি নিজের আনীতকালামের মোকাবেলা করার জন্যে আরবের স্বনামখ্যাত প্রাঞ্জলভাষী কবি-সাহিত্যিক ও অলঙ্কারবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ দিলেন। তারা মহানবী (সাঃ)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে স্বীয় জান-মাল, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত, কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কোরআনের একটি আয়াতের অনুরূপ বাক্য রচনা করার সাহস

তাদের কারও হল না।

এভাবে নবীকরীম (সাঃ) এবং কোরআনের অস্তিত্ব ছিল সত্যের এক বিরাট নিদর্শন। এছাড়া মহানবী(সাঃ) – এর মাধ্যমে হাজারো মো'জেযা ও খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পায়, যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ যা অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু কাফেররা এসব নিদর্শনকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। তাই আয়াতে বলা হয়েছেঃ

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ

আয়াতের শেষে তাদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যারোপের অশুভ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ –অর্থাৎ, আজ তো এসব অপরিনামদর্শী লোকেরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর মো'জেযা, তাঁর আনীত হেদায়াত, কেয়ামত ও পরকাল সবকিছু নিয়েই হাস্যোপহাস করছে, কিন্তু সে সময় দূরে নয়, যখন এগুলোর স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে। কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। ঈমান ও আমলের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পাবে। তখন এগুলোকে বিশ্বাস ও স্বীকার করলেও কোন উপকার হবে না। কেননা, সেটা কর্ম জগৎ নয়— প্রতিদান দিবস। আল্লাহ্ তাআলা এখনও চিন্তা–ভাবনার সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে খোদায়ী নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা খোদায়ী বিধান ও পয়গম্বরগণের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত কিংবা বিরোধিতা করত, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অবিশ্বাসীর দৃষ্টি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট করে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে বিশ্ব–ইতিহাস একটি শিক্ষাগ্রন্থ। জ্ঞানচক্ষু মেলে নিরীক্ষণ করলে এটি হাজারো উপদেশের চাইতে অধিক কার্যকরী উপদেশ। ''জগৎ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কাল উৎকৃষ্ট শিক্ষক'' – জনৈক দার্শনিকের এ উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণেই কোরআন পাকের একটি বিরাট বিষয়বস্তু হচ্ছে কাহিনী ও ইতিহাস। কিন্তু সাধারণভাবে অমনোযোগী মানুষেরা জগতের ইতিহাসকেও একটি চিত্তবিনোদনের সামগ্রীর চাইতে অধিক গুরুত্ব দেয়নি, বরং উপদেশ ও জ্ঞানের এ উৎকৃষ্ট বিষয়টিকেও তারা অমনোযোগিতা ও গোনাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী কিচ্ছা–কাহিনীকে হয় শুধু ঘুমের পূর্বে ঘুমের ওষুধের স্থলে ব্যবহার করা হয়; না হয় অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

সম্ভবতঃ এ কারণেই কোরআন পাক শিক্ষা ও উপদেশের জন্যে বিশ্ব–ইতিহাসকে বেছে নিয়েছে। তবে কোরআনের বর্ণনাভঙ্গী বিশ্বের সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মত নয়, যাতে কাহিনী ও ইতিহাস রচনাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাই কোরআন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ধারাবাহিক কাহিনীর আকারে বর্ণনা করেনি,বরং কাহিনীর যতটুকু অংশ যে ব্যাপারে ও যে অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত, সে ব্যাপারে ততটুকু অংশই উল্লেখ করেছে। অতঃপর অন্যত্র এ কাহিনীর অন্য অংশ বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বর্ণনা করেছে। এতে এ সত্যের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, কোন কাহিনী কখনও স্বয়ং উদ্দেশ্য হয় না, বরং প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনা করার লক্ষ্য হচ্ছে তা থেকে কোন কার্যকর ফল বের করা। এ কারণে এ ঘটনার যতটুকু অংশ এ লক্ষ্যের জন্যে জরুরী, ততটুকু পাঠ কর এবং সামনে এগিয়ে যাও। স্বীয় অবস্থা পর্যালোচনা কর এবং অতীত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা অর্জন করে আত্মসংশোধনে ব্রতী হও।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর প্রত্যক্ষ সম্বোধিত মক্কাবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা দেখেনি? দেখলে তা থেকে তারা শিক্ষা ও উপদেশ অর্জন করতে পারত। এখানে 'দেখা'র অর্থ তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করা। কেননা, সে জাতিগুলো তখন তাদের সামনে ছিল না। এরপর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও বিপর্যয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে। كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ — অর্থাৎ , তাদের পূর্বে অনেক 'কারণ'কে (অর্থাৎ, সম্প্রদায়কে) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।

قرن শব্দের অর্থ সমসাময়িক লোকসমাজ এবং সুদীর্ঘ কাল। দশ বছর থেকে একশ' বছর পর্যন্ত সময়কাল অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قرن শব্দের অর্থ যে এক শতাব্দী, কোন কোন ঘটনা ও হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে ঃ মহানবী (সাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে বিশর মায়োনীকে বলেছিলেন ঃ তুমি এক 'কারণ' পর্যন্ত জীবিত থাকবে। পরে দেখা গেল যে, তিনি পূর্ণ একশ' বছর জীবিত ছিলেন। মহানবী (সাঃ) জনৈক বালককে দোয়া দেন যে, তুমি এক 'কারণ' জীবিত থেকো। বালকটি পূর্ণ একশ' বছর জীবিত ছিল। خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم এ হাদীসের অর্থ করতে গিয়ে অধিকাংশ আলেম এক 'কারণ' বলতে এক শতাব্দী স্থির করেছেন।

এ আয়াতে অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পৃথিবীতে এমন বিস্তৃতি, শক্তি ও জীবন ধারণের সাজ–সরঞ্জাম দান করেছিলেন, যা পরবর্তী লোকদের ভাগ্যে জুটেনি। কিন্তু তারাই যখন পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং খোদায়ী নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন প্রভূত জাঁকজমক, প্রতাপ–প্রতিপত্তি ও অর্থ–সম্পদ তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারল না। তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আদ ও সামূদ গোত্রের মত শক্তিবল তাদের নেই এবং সিরিয়া ও এয়ামেনবাসীদের অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যশীলও তারা নয়। এসব অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে দেখা তাদের উচিত। বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের পরিণতি কি হবে, তাও ভেবে দেখা দরকার।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার শক্তি–সামর্থ্য শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত, অসাধারণ জাঁকজমক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং জনবহুল ও মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহকে চোখের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে। ফলে কেউ বুঝতেই পারল না যে, এখান থেকে লোকজন হ্রাস পেয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী উমাইয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সামনে একটি হঠকারিতাপূর্ণ দাবী পেশ করে বসল। সে বললো ঃ আমি আপনার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না, যে পর্যন্ত না আপনাকে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসতে দেখব। গ্রন্থে আমার নাম উল্লেখ করে এ আদেশ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে ঃ হে আবদুল্লাহ্, রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। সে আরও বলল ঃ আপনি

এগুলো করে দেখালেও আমার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতসব কথার পরও লোকটি মুসলমান হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইসলামের গাজী হয়ে তায়েফ যুদ্ধে শাহাদতও বরণ করেছিল।

জাতির এহেন অন্যায়, হঠকারিতাপূর্ণ দাবী-দাওয়া এবং উপহাসের ভঙ্গিতে কথাবার্তা পিতা-মাতার চাইতে অধিক স্নেহশীল রসুলে করীম (সাঃ)-এর অন্তরকে কতটুকু ব্যথিত করেছিল, তার সঠিক অনুমান আমরা করতে পারি না। শুধু ঐ ব্যক্তি হয়ত তা অনুভব করতে পারে, যে জাতির মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মত জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে।

তৃতীয় আয়াত অবতরণেরও একটি ঘটনা রয়েছে। পূর্বোল্লেখিত আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া, নযর ইবনে হারেস এবং নওফেল ইবনে খালেদ একবার একত্রিত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে ঃ আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যদি আপনি আকাশ থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসেন। গ্রন্থের সাথে চারজন ফেরেশতা এসে সাক্ষ্য দিবে যে, এ গ্রন্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এসেছে এবং আপনি আল্লাহর রসুল।

আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এর এক উত্তর এই যে, গাফেলরা এসব দাবী-দাওয়া করে মৃত্যু ও ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। কেননা, আল্লাহ্‌র আইন এই যে, কোন জাতি কোন পয়গম্বরের কাছে যখন বিশেষ কোন মো'জেযা দাবী করে এবং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের দাবী পূরণ করে দেওয়া হয়, তখন ইসলাম গ্রহণে সামান্য দেরীও সহ্য করা হয় না। ব্যাপক আযাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মক্কাবাসীরাও এ দাবী সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করছিল না যে, তা মেনে নেয়ার আশা করা যেত। তাই বলা হয়েছে ঃ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ অর্থাৎ, আমি যদি তাদের চাহিদা মত মো'জেযা দেখানোর জন্যে ফেরেশতা পাঠিয়ে দেই তবে মো'জেযা দেখার পরও বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্ পক্ষ থেকে ধ্বংসের নির্দেশ জারি হয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দেওয়া হবে না। কাজেই তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাদের চাওয়া মো'জেযা প্রকাশ না করলে তাদেরই মঙ্গল।

এরই দ্বিতীয় উত্তর চতুর্থ আয়াতে অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এরা ফেরেশতা অবতারণের দাবী করে অদ্ভুত বোকামির পরিচয় দিচ্ছে। কেননা, ফেরেশতা যদি আসল আকার-আকৃতিতে সামনে আসে, তবে ভয়ে মানুষের অন্তরাত্মা কাঠ হয়ে যাবে। এমনকি, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার আশঙ্কাও রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি মানবাকৃতি ধারণ করে ফেরেশতা সামনে আসে, যেমন জিবরাঈল বহুবার মহানবী (সাঃ)-এর কাছে এসেছেন, তবে তারা তাঁকে একজন মানুষই মনে করবে এবং তাদের আপত্তি পূর্বাবস্থায়ই বহাল থাকবে।

এসব হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তার উত্তর দেওয়ার পর পঞ্চম আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-এর সান্ত্বনার জন্যে বলা হয়েছে ঃ স্বজাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব পয়গম্বরকে এমনি হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতি ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তারা সাহস হারায়নি। পরিণামে বিদ্রূপকারী জাতিকে সে আযাবই পাকড়াও করেছে, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

মোটকথা এই যে, আল্লাহর বিধানাবলী প্রচার করাই আপনার কাজ। এ দায়িত্ব পালন করে আপনি দায়মুক্ত হয়ে যান। কেউ তা গ্রহণ করল কি না তা দেখাশোনা করা আপনার দায়িত্বে নয়। তাই এতে মশগুল হয়ে আপনি অন্তরকে ব্যথিত করবেন।

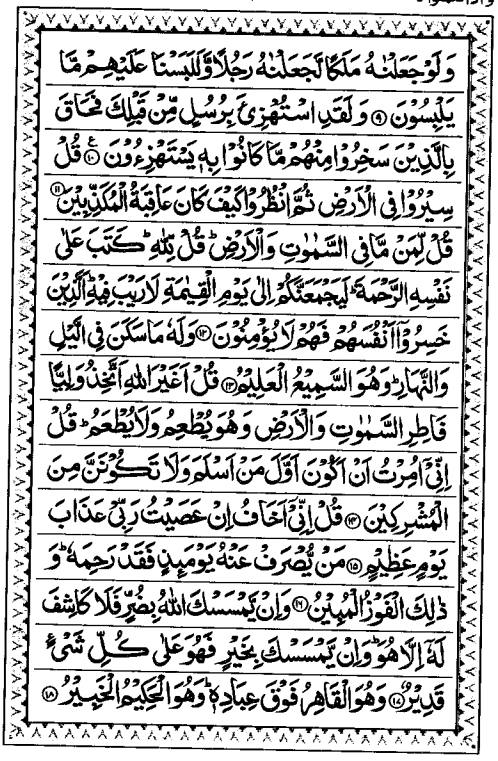

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا
يَلْبِسُوْنَ ۝٩ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ
بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠ قُلْ
سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝١١
قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلْ لِّلّٰهِ ۭ كَتَبَ عَلٰي
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۭ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ اَلَّذِيْنَ
خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١٢ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ
وَالنَّهَارِ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝١٣ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا
فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۭ قُلْ
اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ ۝١٤ قُلْ اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝١٥ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ۭ وَ
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ۝١٦ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۭ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ۝١٧ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۭ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝١٨

(৯) যদি আমি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হত। এতেও ঐ সন্দেহই করত, যা এখন করছে। (১০) নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত। (১১) বলে দিন ঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে? (১২) জিজ্ঞেস করুন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তার মালিক কে? বলে দিন ঃ মালিক আল্লাহ্। তিনি অনুকম্পা প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। এর আগমনে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে না। (১৩) যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (১৪) আপনি বলে দিন ঃ আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত—যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি সবাইকে আহার্য দান করেন ও তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না—অপরকে সাহায্যকারী স্থির করব? আপনি বলে দিন ঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই আজ্ঞাবহ হব। আপনি কদাচ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (১৫) আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হতে ভয় পাই কেননা, আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি। (১৬) যার কাছ থেকে ঐদিন এ শাস্তি সরিয়ে নেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহ্র অনুকম্পা হবে। এটাই বিরাট সাফল্য। (১৭) আর যদি আল্লাহ্ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান (১৮) তিনিই পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের উপর। তিনিই জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ আয়াতে কাফেরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে যা আছে, তার মালিক কে? অতঃপর আল্লাহ নিজেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাচনিক উত্তর দিয়েছেন ঃ সবার মালিক আল্লাহ্। কাফেরদের উত্তরের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই উত্তর দেয়ার কারণ এই যে, এ উত্তর কাফেরদের কাছেও স্বীকৃত। তারা যদিও শিরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল, তথাপি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ্ তাআলাকেই মানত।

لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ বাক্যে الى শব্দটি فى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে মর্ম দাঁড়িয়েছে এই যে, আল্লাহ তাআলা আদি-অন্ত সব মানুষকে কেয়ামতের দিন সমবেত করবেন কিংবা এখানে কবরে একত্রিত করা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামত পর্যন্ত সব মানুষকে কবরে একত্রিত করতে থাকবেন এবং কেয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত করবেন।– (কুরতুবী)

كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ছহীহ্ মুসলীমে হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তাআলা যাবতীয় বস্তুনিচয় সৃষ্টি করেন, তখন একটি ওয়াদাপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এটি আল্লাহ্ তাআলার কাছেই রয়েছে। এতে লিখিত আছে ঃ আমার অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে।– (কুরতুবী)

اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ এতে ইঙ্গিত আছে যে, আয়াতের শুরুতে বর্ণিত আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপক অনুগ্রহ থেকে যদি কাফের ও মুশরেকরা বঞ্চিত হয়, তবে স্বীয় কৃতকর্মের কারণেই হবে। কারণ, তারা অনুগ্রহ লাভের উপায় অর্থাৎ, ঈমান অবলম্বন করেনি।– (কুরতুবী)

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ এখানে سكون অর্থ استقرار অবস্থান করা ; অর্থাৎ, পৃথিবীর দিবারাত্রিতে যা কিছু অবস্থিত আছে, তা সবই আল্লাহর অথবা এর অর্থ سكون وحركت এর সমষ্টি। অর্থাৎ, ما سكن وما تحرك (স্থাবর ও অস্থাবর)। আয়াতে শুধু سكون উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত حركت আপনা-আপনিই বোঝা যায়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত সমূহের প্রথম আয়াতে এ নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি বলেদিন ঃ মনে কর, যদি আমিও স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমারও কেয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। এটা জানা কথা যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিষ্পাপ। তাঁর দ্বারা অবাধ্যতা হতেই পারে না। কিন্তু তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে উম্মতকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, এ নির্দেশের বিরোধিতা করলে যখন নবীগণের সর্দারকেও ক্ষমা করা যায় না, তখন অন্যরা কোন ছার!

এরপর বলা হয়েছে ঃ مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَىِٕذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ —অর্থাৎ, হাশর দিবসের শাস্তি অত্যন্ত লোমহর্ষক ও কঠোর হবে। কারও উপর থেকে এ শাস্তি সরে গেলে মনে করতে হবে যে, তার প্রতি আল্লাহ্র অশেষ করুণা হয়েছে। وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ, এটিই বৃহৎ ও প্রকাশ্য সফলতা। এখানে সফলতার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ। এতে বোঝা গেল যে, শাস্তি থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ أَئِنَّكُمْ
لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُل لَّا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا
هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ
الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ۘ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ
كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا
ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ
تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا
مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم
مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن يَرَوْا كُلَّ
آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ
وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

(১৯) আপনি জিজ্ঞেস করুন ঃ সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে? বলে দিন ঃ আল্লাহ্‌ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি এ কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে— যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ কোরআন পৌঁছে–সবাইকে ভীতি-প্রদর্শন করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য উপাস্যও রয়েছে? আপনি বলে দিন ঃ আমি এরূপ সাক্ষ্য দেব না। বলে দিন ঃ তিনিই একমাত্র উপাস্য; আমি অবশ্যই তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। (২০) যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চিনে, যেমন তাদের সন্তানদেরকে চিনে। যারা নিজেদেরকে ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (২১) আর যে আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তার চাইতে বড় জালেম কে? নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না। (২২) আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা শিরক করেছিল, তাদেরকে বলব ঃ যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায়? (২৩) অতঃপর তাদের কোন অপরিচ্ছন্নতা থাকবে না; তবে এটুকুই যে তারা বলবে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। (২৪) দেখতো, কিভাবে মিথ্যা বলছে নিজেদের বিপক্ষে? এবং যেসব বিষয় তারা আপনার প্রতি মিছামিছি রচনা করত, তা সবই উধাও হয়ে গেছে। (২৫) তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান লাগিয়ে থাকে। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে একে না বুঝে এবং তাদের কানে বোঝা ভরে দিয়েছি। যদি তারা সব নিদর্শন অবলোকন করে তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না। এমনকি, তারা যখন আপনার কাছে ঝগড়া করতে আসে, তখন কাফেররা বলে ঃ এটি পূর্ববর্তীদের কিচ্ছাকাহিনী বৈ তো নয়। (২৬) তারা এ থেকে বাধা প্রদান করে এবং এ থেকে পলায়ন করে। তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে, কিন্তু বুঝছে না।

দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তাআলা। সত্যিকারভাবে কোন ব্যক্তি কারও সামান্য উপকারও করতে পারে না ক্ষতিও করতে পারে না। আমরা বাহ্যতঃ একজনকে অপরজন দ্বারা উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখি। এটি নিছক একটি বাহ্যিক আকার। সত্যের সামনে একটি পর্দার চাইতে বেশী এর কোন গুরুত্ব নেই।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখা প্রসঙ্গে ইমাম বগভী হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একবার রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) উটে সওয়ার হয়ে আমাকে পিছনে বসিয়ে নিলেন। কিছু দূর চলার পর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ হে বৎস! আমি আরয করলাম ঃ আদেশ করুন, আমি হাযির আছি। তিনি বললেন ঃ "তুমি আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখবে, আল্লাহ্‌ তোমাকে স্মরণ রাখবেন।" তুমি আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখলে সর্বাবস্থায় তাঁকে সামনে দেখতে পাবে। তুমি শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখলে, বিপদের সময় তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন। কোন কিছু যাচ্ঞা করতে হলে তুমি আল্লাহ্‌র কাছেই যাচ্ঞা কর এবং সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাও। জগতে যা কিছু হবে, ভাগ্যের লেখনী তা লিখে ফেলেছে। তোমার অংশে নেই—তোমার এমন কোন উপকার করতে সমগ্র সৃষ্টজীব সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে, তারা কখনও তা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই মিলে তোমার এমন কোন ক্ষতি করতে চায়, যা তোমার ভাগ্যে নেই, তবে কখনই তারা তা করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাস সহকারে ধৈর্যধারণ করতে পার তবে অবশ্যই তা করো। সক্ষম না হলে ধৈর্য ধর। কেননা, স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজে ধৈর্য ধরার মধ্যে অনেক মঙ্গল রয়েছে। মনে রাখবে, আল্লাহ্‌র সাহায্য ধৈর্যের সাথে জড়িত—কষ্টের সাথে সুখ এবং অভাবের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত।'- (তিরমিযী, মুসনাদে-আহমদ)

পরিতাপের বিষয়, কোরআন পাকের এ সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর আজীবনের শিক্ষা সত্ত্বেও মুসলমানরা এ ব্যাপারে পথভ্রান্ত। তারা আল্লাহ্‌ তাআলার সব ক্ষমতা সৃষ্টজীবের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে। আজ এমন মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য নয়, যারা বিপদের সময় আল্লাহ্‌ তাআলাকে স্মরণ করে না বরং তারা তাঁর কাছে দোয়া করার পরিবর্তে বিভিন্ন নামের দোহাই দেয় এবং তাদেরই সাহায্য কামনা করে। তারা আল্লাহ্‌ তাআলার প্রতি লক্ষ্য করে না। পয়গম্বর ও ওলীদের ওসিলায় দোয়া করা ভিন্ন কথা। এটা জায়েয। স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষায় এর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সরাসরি কোন সৃষ্টজীবকে অভাব পূরণের জন্যে ডাকা এ কোরআনী নির্দেশের পরিপন্থী ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর। আল্লাহ্‌ তাআলা মুসলমানদেরকে সরল পথে কায়েম রাখুন।

আয়াতের শেষে বলেছেন ঃ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলাই সবার উপর পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সবাই তাঁর ক্ষমতাধীন ও মুখাপেক্ষী। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন মহত্তম ব্যক্তিগণও সব কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে না এবং তার সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না; তিনি নৈকট্যশীল রসূলই হোন কিংবা রাজাধিরাজ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুশরেকদের ব্যর্থতার অবস্থা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, অত্যাচারী ও কাফেররা সফলতা পাবে না। আলোচ্য আ-য়াতসমূহে এর বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে একটি সর্ববৃহৎ পরীক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে যা হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের সামনে অনুষ্ঠিত হবে। বলা হয়েছে ঃ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا

অর্থাৎ, ঐ দিনটিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি সবাইকে অর্থাৎ, মুশরক ও তাদের তৈরী করা উপাস্যসমূহকে একত্রিত করব। ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদেরকে প্রশ্ন করব যে, তোমরা যেসব উপাস্যকে আমার অংশীদার, স্বীয় অভাব পূরণকারী ও বিপদ বিদূরণকারী মনে করতে, আজ তারা কোথায়? তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন?

এখানে ثُمَّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিলম্ব ও দেরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে বুঝা যায় যে, হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে না, বরং সবাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত হতবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অনেক কাল পর হিসাব-কিতাব ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ্ তাআলা হাশরের ময়দানে তোমাদেরকে এমনভাবে একত্রিত করবেন, যেমন তীরসমূহকে তূণীরে একত্রিত করা হয়। পঞ্চাশ হাজার বছর তোমরা এমনিভাবে থাকবে। অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এক হাজার বছর পর্যন্ত সবাই অন্ধকারে থাকবে। পরস্পর কথাবার্তাও বলতে পারবে না।— (মুস্তাদরাক, বায়হাকী)।

উপরোক্ত দুই হাদীসে পঞ্চাশ হাজার ও এক হাজারের যে পার্থক্য, তা কোরআন পাকের দুই আয়াতেও উল্লেখিত আছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ, ঐ দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ অর্থাৎ, একদিন তোমার প্রতিপালকের কাছে এক হাজার বছরের মত হবে। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, এ দিনটি তীব্র কষ্ট ও কঠোর শ্রমের দিক দিয়ে দীর্ঘ হবে। কষ্ট ও শ্রমের স্তর বিভিন্ন রূপ হবে। তাই কারও কাছে এ দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের এবং কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান বলে মনে হবে।

সারকথা, এ মহাপরীক্ষা কেন্দ্রে প্রথমতঃ দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরীক্ষা শুরুই হবে না। এমনকি সবাই বাসনা করতে থাকবে যে, কোনরূপে পরীক্ষা ও হিসাব-কিতাব হয়ে যাক- পরিণতি যাই হোক, এ অনিশ্চয়তার কষ্ট তো দূর হবে। এ দীর্ঘ অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে ثُمَّ শব্দ প্রয়োগ করে ثُمَّ نَقُولُ বলা হয়েছে। এমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে মুশরেকদের পক্ষ থেকে যে উত্তর বর্ণিত হয়েছে, তাতেও ثُمَّ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তারাও দীর্ঘ বিরতির পর যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তর দেবে ঃ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কসম, আমরা মুশরেক ছিলাম না। এ আয়াতে তাদের উত্তরকে فِتْنَة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি পরীক্ষার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কারও প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থই সম্ভবপর। প্রথম অর্থে তাদের পরীক্ষার উত্তরকেই পরীক্ষা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, এরা পৃথিবীতে এসব মূর্তি ও স্বহস্ত নির্মিত উপাস্যদের প্রতি আসক্ত ছিল, স্বীয় অর্থ-সম্পদ এদের জন্যেই উৎসর্গ করত। কিন্তু আজ সব ভালবাসা ও আসক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং এ ছাড়া তাদের মুখে কোন উত্তর যোগাচ্ছে না। কাজেই তাদের থেকে নির্লিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারই দাবী করে বসল।

তাদের উত্তরে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলী এবং রাব্বুল আলামীনের শক্তি-সামর্থের অভাবনীয় ঘটনাবলী দেখার পর তারা কোন সাহসে রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে এমন নির্জলা মিথ্যা বলতে পারল! তাও এমন বলিষ্ঠ চিত্তে যে, আল্লাহ্র মহান সত্তার কসম খেয়ে বলছে যে, আমরা মুশরেক ছিলাম না।

অধিকাংশ তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেন ঃ তাদের এ উত্তর বিবেক-বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং ভয়ের আতিশয্যে হতবুদ্ধিতার আবেশে মুখে যা এসেছে, তাই বলেছে। কিন্তু হাশরের সাধারণ ঘটনাবলী ও অবস্থা চিন্তা করলে এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টির সামনে আনার জন্যে তাদেরকে এ শক্তিও দিয়েছেন যেন, তারা পৃথিবীর মত অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে যা ইচ্ছা বলুক- যাতে কুফর ও শিরকের সাথে সাথে তাদের এ দোষটিও হাশরবাসীদের জানা হয়ে যায় যে, তারা মিথ্যা ভাষণে অদ্বিতীয় পটু। এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কোরআন পাকের অপর এক আয়াতে يَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ বলে এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাক্যটির অর্থ এই যে, এরা মুসলমানদের সামনে যেমন মিথ্যা কসম খায়, তেমনি স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের সামনেও মিথ্যা কসম খেতে দ্বিধা করবে না।

হাশরের ময়দানে যখন তারা কসম খেয়ে নিজ নিজ শেরেকী ও কুফরী অস্বীকার করবে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা তাদের মুখে মোহর এঁটে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হস্তপদকে নির্দেশ দিবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও, তারা কি করতো। তখন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের হস্ত-পদ, চক্ষু-কর্ণ - এরা সবাই ছিল আল্লাহ্ তাআলার গুপ্ত পুলিশ। তারা সব কাজকর্ম একটি একটি করে সামনে তুলে ধরবে। এ সম্পর্কেই সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে ঃ

অদ্য আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

এহেন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কেউ কোন তথ্য গোপনে ও মিথ্যা ভাষণে দুঃসাহসী হবে না।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا অর্থাৎ, ঐদিন তারা আল্লাহ্র কাছ থেকে কোন কথা গোপন করতে পারবে না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এর অর্থ এই যে, প্রথম প্রথম তারা খুব মিথ্যা বলবে এবং মিথ্যা কসম খাবে, কিন্তু স্বয়ং তাদের হস্তপদ যখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন কেউ ভুল কথা বলতে সাহসী হবে না।

মহাবিচারপতির আদালতে সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। পৃথিবীতে যেভাবে সে মিথ্যা বলত, তখনও তার মিথ্যা বলার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তার মিথ্যার আবরণ স্বয়ং তার হস্তপদের সাক্ষ্য দ্বারা উন্মোচিত করে দিবেন।

মৃত্যুর পর কবরে মুনকীর-নকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সামনে প্রথম পরীক্ষা হবে। একে ভর্তি পরীক্ষা বলা যেতে পারে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মুনকির-নাকীর যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করবে, من ربك وما دينك অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক কে এবং তোমার দ্বীন

কি? কাফের বলবে هاه هاه لا ادرى অর্থাৎ হায়, হায়! আমি কিছুই জানি না। এর বিপরীতে মুমিন বলবে, ودينى الاسلام আমার প্রতিপালক, আল্লাহ্ এবং আমার দ্বীন, ইসলাম। এতে বুঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নতুবা কাফের ও মুমিনের ন্যায় উত্তর দিতে পারতো। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হচ্ছেন ফেরেশতা। তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং তারা হস্তপদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে অক্ষম। এখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হলে ফেরেশতা তার উত্তর অনুযায়ীই কাজ করতো, ফলে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। হাশরের পরীক্ষা এরূপ নয়। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর সরাসরি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমানের সাথে হবে। সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা কার্যকরী হবে না।

তফসীর 'বাহ্‌রে-মুহীত' ও 'মাযহারী'তে কোন কোন তফসীরবিদের এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে স্বীয় শিরককে অস্বীকার করবে, তারা হলো সেসব লোক, যারা কোন সৃষ্টজীবকে খোলাখুলি আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি না বলেও আল্লাহ্‌র সব ক্ষমতা সৃষ্টজীবে বন্টন করে দিয়েছিল। সৃষ্টজীবের কাছেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাঞ্চা করত, তাদের নামে নৈবেদ্য প্রদান করত এবং তাদের কাছেই স্বাস্থ্য, রুযী-রোযগার, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য যাবতীয় মনোবাঞ্ছা প্রার্থনা করতো। তারা নিজেদেরকে মুশরেক মনে করত না। তাই হাশরের ময়দানেও কসম খেয়ে বলবে যে, তারা মুশরেক ছিল না। কিন্তু কসম খাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা তাদের লাঞ্ছিত করবেন।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কোরআনের কোন কোন আয়াতের দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা কাফের ও গোনাহ্‌গারদের সাথে কথা বলবেন না। অথচ আলোচ্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি কথা বলবেন।

উত্তর এই যে, এ সম্বোধন ও কথাবার্তা সম্মান প্রদান ও প্রার্থনা শ্রবণ হিসেবে হবে না। হুমকি প্রদর্শন ও শাসানির জন্যেও সম্বোধন হবে না, উক্ত আয়াতের অর্থ তা নয়। এ কথাও বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে যে সম্বোধন রয়েছে, তা হবে ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায়। পক্ষান্তরে যে আয়াতে সম্বোধন ও কথাবার্তা হবে না বলে বলা হয়েছে, সেখানে প্রত্যক্ষ কথাবার্তা বুঝানো হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

—এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে যে, দেখুন, তারা নিজেদের বিপক্ষে কেমন মিথ্যা বলেছে; আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যাদেরকে তারা মিছামিছি শরীক তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অর্থ এই যে, এ মিথ্যার শাস্তি তাদের উপরই পতিত হবে। মনগড়া তৈরী করার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার করার ব্যাপারটি ছিল মিছামিছি (শরীক) ও মনগড়া। আজ বাস্তব সত্য সামনে এসে যাওয়ায় এ মিথ্যা অকেজো হয়ে গেছে। মনগড়া তৈরীর অর্থ মিথ্যা কসমও হতে পারে, যা হাশরের ময়দানে উচ্চারণ করবে। অতঃপর হস্তপদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা সে মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন ঃ মনগড়া তৈরী করা বলে মুশরেকদের ঐসব অপব্যাখ্যা বুঝানো হয়েছে, যা তারা দুনিয়াতে মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে বর্ণনা করত। উদাহরণতঃ তারা বলতঃ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ অর্থাৎ, আমরা উপাস্য মনে করে মূর্তির উপাসনা করি না, বরং উপাসনা করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করে আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেবে। হাশরে তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে, তাদের মহাবিপদের সময় কেউ তাদের সুপারিশ করবে না।

উভয় আয়াতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, হাশরের ভয়াবহ ময়দানে মুশরিকদেরকে যা ইচ্ছা, বলার স্বাধীনতাদানের মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যা বলার অভ্যাস একটি দুষ্ট অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন। সুতরাং যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কসম খেত, তারা এখানেও তা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। ফলে সমগ্র সৃষ্টজগতের সামনে তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে মিথ্যা বলার নিন্দা জোরালো ভাষায় করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে মিথ্যাবাদীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপাচারের দোসর। মিথ্যা ও পাপাচার উভয়ই জাহান্নামে যাবে। - (ইবনে-হাব্বান)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ যে কাজের দরুন মানুষ দোযখে যাবে, তা কি? তিনি বললেন ঃ সে কাজ হচ্ছে মিথ্যা। - (মুসনাদে-আহমদ)

মে'রাজ রজনীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির চোয়াল চিরে দেওয়া হচ্ছে। সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে। অতঃপর আবার চিরে দেওয়া হচ্ছে। তার সাথে এ কার্যধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তিনি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যক্তি কে? জিবরাঈল বললেন ঃ এ হল মিথ্যাবাদী।

মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করা পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারে না। এমনকি, হাসি-ঠাট্টা ছলেও মিথ্যা না বলা উচিত।

বায়হাকীতেও ছহীহ্ সনদ সহকারে বর্ণিত আছে, মুসলমানের মধ্যে অন্য কু-অভ্যাস থাকতে পারে, কিন্তু আত্মসাৎ ও মিথ্যা থাকতে পারে না। অন্য এক হাদীসে আছে, মিথ্যা মানুষের রিযিক কমিয়ে দেয়।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ যাহ্হাক, কাতাদাহ্, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (রাহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণের মতে এ আয়াত মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কোরআন শুনতে ও অনুসরণ করতে লোকদের বারণ করত এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরও বর্নিত আছে যে, এ আয়াত মহানবী (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেব ও আরও কয়েকজন চাচা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা তাঁকে সমর্থন করতেন এবং কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। এমতাবস্থায় عَنْهُ শব্দের সর্বনামটির অর্থ কোরআনের পরিবর্তে নবী করীম (সাঃ) হবেন। - (মাযহারী)

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ
بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا
يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ
بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ
هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا
كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰٓ
إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا
وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾ وَ
مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي
يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ
يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ
مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰٓ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِي الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾

(২৭) আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে দোযখের উপর দাঁড় করানো হবে! তারা বলবে ঃ কতই না ভাল হত, যদি আমরা পুনঃ প্রেরিত হতাম; তা হলে আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। (২৮) এবং তারা ইতিপূর্বে যা গোপন করত, তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদি তারা পুনঃ প্রেরিত হয়, তবুও তাই করবে, যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (২৯) তারা বলে ঃ আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। (৩০) আর যদি আপনি দেখেন; যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন ঃ এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম। তিনি বলবেন ঃ অতএব, স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আস্বাদন কর। (৩১) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহ্র সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি, যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবে ঃ হায় আফসোস, এর ব্যাপারে আমরা কতই না ত্রুটি করেছি! তারা স্বীয় বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করবে। শুনে রাখ, তারা যে বোঝা বহন করবে, তা নিকৃষ্টতর বোঝা। (৩২) পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেযগারদের জন্যে শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ না? (৩৩) আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করে। অতএব, তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। (৩৪) আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গাম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে ছবর করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহ্র বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গাম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামের তিনটি মূলনীতি রয়েছে– (১) একত্ববাদ, (২) রেসালত ও (৩) আখেরাতে বিশ্বাস। অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ ও জীবনের লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাকে এক সরল ও স্বচ্ছ পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। এগুলোর মধ্যে পরকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির বিশ্বাস কার্যতঃ এমন একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের গতি বিশেষ একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ কারণেই কোরআন পাকের সব বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যেই চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে পরকালের প্রশ্ন ও উত্তর, কঠোর শাস্তি, অশেষ ছওয়াব এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ পরকালে যখন তাদেরকে দোযখের কিনারায় দাঁড় করানো হবে এবং তারা কল্পনাতীত ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা আকাঙ্খা প্রকাশ করে বলবে, আফসোস, আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করা হলে আমরা পালনকর্তা প্রেরিত নিদর্শনাবলী ও নির্দেশনাবলীকে মিথ্যারোপ করতাম না, বরং এগুলো বিশ্বাস করে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

দ্বিতীয় আয়াতে সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত, মহাবিচারপতি তাদের বিহ্বল আকাঙ্খার রহস্য উন্মোচন করে বলেছেন ঃ এরা চিরকালই মিথ্যায় অভ্যস্ত ছিল। এ আকাঙ্খায়ও এরা মিথ্যাবাদী। আসল ব্যাপার এই যে, পয়গম্বরদের মাধ্যমে যেসব বাস্তব সত্য তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল এবং তারা তা জানা ও চেনা সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা কিংবা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে এসব সত্যকে পর্দায় আবৃত রাখার চেষ্টা করত। আজ সেগুলো একটি একটি করে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে, আল্লাহ্ পাকের একচ্ছত্র অধিকার ও শক্তি-সামর্থ্য চোখে দেখেছে, পয়গম্বরদের সত্যতা অবলোকন করেছে, পরকালে পুনর্জীবিত হওয়া যা সব সময়ই তারা অস্বীকার করত, নির্মম সত্য হয়ে সামনে এসেছে, প্রতিদান ও শাস্তি প্রকাশ হতে দেখেছে এবং দোযখও দেখেছে। কাজেই বিরোধিতা করার কোন ছুতা তাদের হাতে অবশিষ্ট রইল না। তাই এমনিতেই বলতে শুরু করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনর্বার প্রেরিত হলে ঈমানদার হয়ে ফিরতাম।

তাদের এ উক্তিকে মিথ্যা বলা পরিণতির দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ, তারা যে ওয়াদা করছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মিথ্যারোপ করব না, এর পরিণতি কিন্তু এরূপ হবে না; তারা দুনিয়াতে পৌঁছে আবারও মিথ্যারোপ করবে। এ মিথ্যা বলার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা এখনও যা কিছু বলছে, তা সদিচ্ছায় বলছে না, বরং সাময়িক বিপদ টলানোর উদ্দেশ্যে, শাস্তির কবল থেকে বাঁচার জন্যে বলছে–অন্তরে এখনও তাদের সদিচ্ছা নেই।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا এর عطف হয়েছে عَادُوا এর উপর। অর্থ এই যে, যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে সেখানে পৌঁছে একথাই বলবে যে, আমরা এ পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন মানি না; এ জীবনই একমাত্র জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে যে, যখন কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তিকে একবার স্বচক্ষে দেখেছে, তখন

দুনিয়াতে এসে পুনরায় তা অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভবপর?

উত্তর এই যে, অস্বীকার করার জন্যে বাস্তবে ঘটনাবলীর বিশ্বাস না থাকা জরুরী নয়। বরং আজকাল যেমন অনেক কাফের ইসলামী সত্যসমূহে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা বশতঃ ইসলামকে অস্বীকার করে চলছে, এমনিভাবে তারা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন ও পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এগুলো অস্বীকারে প্রবৃত্ত হবে। কোরআন পাক বর্তমান জীবনে কোন কোন কাফের সম্পর্কে বলে ঃ

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا অর্থাৎ, তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করছে কিন্তু তাদের অন্তরে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। যেমন, ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা শেষ নবী (সাঃ)- কে এমনভাবে চেনে, যেমন স্বীয় সন্তানদেরকে চেনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে আছে।

মোট কথা, জগৎস্রষ্টা স্বীয় আদি জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে, তাদের এ বক্তব্য যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মুমিন হয়ে যাব, – সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামুলক। তাদের কথা অনুযায়ী পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিলেও তারা আবার তাই করবে, যা প্রথম জীবনে করত।

তফসীর মাযহারীতে তিবরানীর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, হিসাব–কিতাবের সময় আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আঃ)–কে বিচার দণ্ডের কাছে দাঁড় করিয়ে বলবেন ঃ সন্তানদের কাজকর্ম স্বচক্ষে পরিদর্শন কর। যার সৎকর্ম পাপকর্মের চাইতে এক রতি বেশী হয়, তাকে তুমি জান্নাতে পৌছাতে পার। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলবেন ঃ আমি জাহান্নামের আযাবে ঐ ব্যক্তিকে প্রবিষ্ট করাব, যার সম্পর্কে জানি যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলেও পূর্বের মতই কাজ করবে।

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন সৎ লোকদের কাজকর্ম তাদের বাহন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অসৎ লোকদের কাজকর্ম ভারী বোঝার আকারে তাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কাফের ও পাপীরা হাশরের ময়দানে প্রাণরক্ষার্থে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নানা ধরনের কথা–বার্তা বলবে। কখনও মিথ্যা কসম খাবে, কখনও দুনিয়ায় পুনঃ প্রেরিত হওয়ার আকাঙ্খা করবে। কিন্তু একথা কেউ বলবে না যে, আমরা এখন বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং এখন সৎকাজ করব। কেননা, এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে যে, এ জগৎ কর্মজগৎ নয় এবং বিশ্বাস স্থাপন ততক্ষণ পর্যন্তই শুদ্ধ, যতক্ষণ তা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন হয়। দেখার পর সত্য জানা, তা দেখারই প্রতিক্রিয়া –আল্লাহ্ ও রসূলকে সত্য জানা নয়। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, এর ফলাফল –অর্থাৎ, চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ, দুনিয়াতে শান্তিময় পবিত্র জীবন এবং পরকালে জান্নাত লাভ শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এর পূর্বে আত্মাজগতে এগুলো অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এর পরে পরকালেও এগুলো উপার্জন করা সম্ভবপর নয়।

এতে ফুটে উঠল যে, পার্থিব জীবন অনেক বড় নেয়ামত এবং অত্যন্ত মুল্যবান বিষয়। উপরোক্ত সুমহান সওদা এ জীবনেই ক্রয় করা যায়। তাই ইসলামে আত্মহত্যা হারাম এবং মৃত্যুর জন্য দোয়া ও মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ। কারণ এতে আল্লাহ্ তাআলার একটি বিরাট নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

সারকথা এই যে, দুনিয়াতে যে বস্তুটি প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হয়েছে এবং যা সর্বাধিক মূল্যবান ও প্রিয়, তা হচ্ছে মানুষের জীবন। একথাও সবার জানা যে, মানুষের জীবনের একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডি রয়েছে কিন্তু জীবনের সঠিক সীমা কারও জানা নেই যে, তা সত্তর বছর হবে, না সত্তর ঘন্টা, না একটি শ্বাস ছাড়ারও সময় পাওয়া যাবে না।

وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ
نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ
الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَ
قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ
يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ
يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ
اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ
مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

(৩৫) আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে আপনি যদি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন, অতঃপর তাদের কাছে কোন একটি মোজেযা আনতে পারেন, তবে নিয়ে আসুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সবাইকে সরল পথে সমবেত করতে পারতেন। অতএব, আপনি নির্বোধদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (৩৬) তারাই মানে, যারা শ্রবণ করে। আল্লাহ্ মৃতদেরকে জীবিত করে উত্থিত করবেন। অতঃপর তারা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৩৭) তারা বলেঃ তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলে দিনঃ আল্লাহ্ নিদর্শন অবতারণ করতে পূর্ণ সক্ষম; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩৮) আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে। (৩৯) যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা অন্ধকারের মধ্যে মূক ও বধির। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (৪০) বলুন, বলতো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তবে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে ডাকবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৪১) বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর যে বিপদের জন্যে তাঁকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তা দূরও করে দেন। যাদেরকে অংশীদার করছ, তখন তাদেরকে ভুলে যাবে। (৪২) আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে। (৪৩) অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব আসল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না? বস্তুতঃ তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ

অর্থাৎ, কাফেররা প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে না, বরং আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতিই মিথ্যারোপ করে। সুদ্দীর বাচনিক তফসীরে মাযহারীতে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার দু'জন কাফের সর্দার আখনাস ইবনে শরীক ও আবু জাহলের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে আখনাস আবু জাহলকে জিজ্ঞেস করল ঃ হে আবুল হিকাম! (আরবে আবু জাহল 'আবুল হিকাম' (জ্ঞানধর) নামে খ্যাত ছিল। ইসলামযুগে কুফ্রী ও হঠকারিতার কারণে তাকে 'আবু জাহল' (মূর্খতাধর) উপাধি দেয়া হয়।) আমরা এখন একান্তে আছি। আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনবে না; মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে তোমার সঠিক ধারণা কি' আমাকে সত্য সত্য বল? তাকে সত্যবাদী মনে কর, না মিথ্যাবাদী?

আবু জাহল আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলল ঃ নিঃসন্দেহে মুহম্মদ সত্যবাদী। তিনি সারা জীবন মিথ্যা বলেননি। কিন্তু ব্যাপার এই যে, কোরাইশ গোত্রের একটি শাখা 'বনী-কুসাই' এসব গৌরব ও মহত্ত্বের সমাবেশ ঘটবে, অবশিষ্ট কোরাইশরা রিক্ত হস্ত থেকে যাবে— আমরা তা কিরূপে সহ্য করতে পারি? পতাকা বনী-কুসাই-এর হাতে রয়েছে। হরম শরীফে হাজীদেরকে পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তাদের দখলে। খানায়ে-কা'বার প্রহরা ও চাবি তাদের করায়ত্ত। এখন যদি আমরা নবুওয়তও তাদের ছেড়ে দেই, তবে অবশিষ্ট কোরাইশদের হাতে কি থাকবে?

নাজিয়া ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, একবার আবু জাহল স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলল ঃ আপনি মিথ্যাবাদী- এরূপ কোন ধারণা আমরা পোষণ করি না। তবে আমরা ঐ ধর্ম ও গ্রন্থকে অসত্য মনে করি, যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন।— (মাযহারী)

এসব রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতটিকে তার প্রকৃত অর্থেও নেয়া যেতে পারে, কোন রূপক অর্থ করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, কাফেররা আপনাকে নয়—আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, কাফেররা বাহ্যতঃ যদিও আপনাকে মিথ্যা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাকে মিথ্যা বলার পরিণাম স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলা। যেমন, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কেই কষ্ট দেয়।

ষষ্ঠ আয়াতে وَمَا مِنْ دَابَّةٍ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কেয়ামতের দিন মানুষের সাথে সর্বপ্রকার জানোয়ারকেও জীবিত করা হবে। ইবনে-জরীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন সব প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষীকুলকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ্ তাআলা এমন সুবিচার করবেন যে, কোন শিং বিশিষ্ট জন্তু কোন শিংবিহীন জন্তুকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকলে এর দিনে তার প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নেয়া হবে। (এমনিভাবে অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়া হবে।) যখন তাদের পারস্পরিক অধিকার ও নির্যাতনের প্রতিশোধ নেয়া সমাপ্ত হবে, তখন আদেশ হবে ঃ 'তোমরা সব মাটি হয়ে যাও।' সব জন্তু তৎক্ষণাৎ মাটির স্তূপে পরিণত হবে। এ সময়েই কাফেররা আক্ষেপ করে বলবে ঃ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا অর্থাৎ, আফসোস আমিও

যদি মাটি হয়ে যেতাম এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যেতাম।

ইমাম বগভী হযরত আবু হোরায়রার বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে, এমনকি, শিংবিহীন ছাগলের প্রতিশোধ শিংবিশিষ্ট ছাগলের কাছ থেকে নেয়া হবে।

সৃষ্টজীবের পাওনার গুরুত্ব ঃ সবাই জানে যে, জীব-জানোয়ারকে কোন শরীয়ত ও বিধি-বিধান পালন করতে আদেশ দেয়া হয়নি, এ আদেশ শুধু মানুষ ও জিনদের প্রতি। একথাও জানা যে, যারা আদিষ্ট নয়, তাদের সাথে প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবহার হতে পারে না। তাই আলেমগণ বলেন ঃ হাশরে জীব-জানোয়ারের প্রতিশোধ তাদের আদিষ্ট হওয়ার কারণে নয়, বরং রাব্বুল-আলামীনের চূড়ান্ত ইনসাফ ও সুবিচারের কারণে এক জন্তুর নির্যাতনের প্রতিশোধ অন্য জন্তুর কাছ থেকে নেয়া হবে। তাদের অন্য কোন কাজের হিসাব-নিকাশ হবে না। এতে বোঝা যায় যে, সৃষ্টজীবের পারস্পরিক পাওনা বা নির্যাতনের ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, আদিষ্ট নয়— এমন জন্তুদেরকেও তা থেকে মুক্ত রাখা হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ধার্মিক ও এবাদতকারী ব্যক্তিও এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে কুফর ও শিরক বাতিল করে একত্ববাদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে মক্কার মুশরেকদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে ঃ যদি আজ তোমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে—উদাহরণতঃ আল্লাহ্‌র আযাব যদি দুনিয়াতেই তোমাদেরকে পাকড়াও করে, কিংবা মৃত্যু অথবা কেয়ামতের ভয়াবহ হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়, তবে চিন্তা করে বল, তোমরা এ বিপদ দূর করার জন্যে কাকে ডাকবে? কার কাছে বিপদমুক্তির আশা করবে? নাকি পাথরের এসব হস্তনির্মিত মূর্তি কিংবা অন্য কোন সৃষ্টজীব, যাদেরকে তোমরা খোদার মর্যাদায় আসীন করে রেখেছ, তারা তখন তোমাদের কাজে আসবে কি? তোমরা তাদের কাছে ফরিয়াদ করবে? না শুধু আল্লাহ্ তাআলাকেই আহ্বান করবে?

এর উত্তর যে কোন সচেতন মানুষের পক্ষ থেকে এছাড়া কিছুই হতে পারে না, যা আল্লাহ্ তাআলা তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, এ ব্যাপক বিপদমুহূর্তে কট্টর মুশরেকই সব মূর্তি ও হস্তনির্মিত উপাস্যদেরকে ভুলে যাবে এবং একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকেই আহ্বান করবে। এখন ফলাফল সুস্পষ্ট যে, তোমাদের মূর্তি এবং ঐ উপাস্য, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র আসনে আসীন করে রেখেছ এবং বিপদ বিদূরণকারী ও অভাব মোচনকারী মনে করছ, তারা যখন এ বিপদ মুহূর্তে তোমাদের কাজে আসবে না এবং তোমরা সাহায্যের জন্যে তাদেরকে আহবান করতেও সাহসী হবে না, তখন তাদের এবাদত কোন্ উপকারে আসবে।

এ বিষয়টি পূর্ববর্তী আয়াতের সারমর্ম। এসব আয়াতে কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ পার্থিব জীবনেও আযাব আসার সম্ভাব্যতা বর্ণিত হয়েছে। ধরে নেয়া যাক, যদি এ জীবনে আযাব নাও আসে, তবে কেয়ামতের আগমন তো অবশ্যম্ভাবী। সেখানে মানুষের সব কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে এবং প্রতিদান ও শাস্তির বিধান জারি হবে।

এখানে ساعة শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ কেয়ামতও হতে পারে এবং 'কেয়ামতে ছুগরা' (ছোট কেয়ামত)-ও হতে পারে। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুতেই এ কেয়ামত কায়েম হয়ে যায়। প্রবাদবাক্য আছে ঃ من مات فقد قامت قيامته অর্থাৎ, যার মৃত্যু হয়, তার কেয়ামত সেদিনই হয়ে যায়। কেননা, কেয়ামতের হিসাব-কিতাবের প্রাথমিক নমুনাও কবর ও বরযখে দেখা যাবে এবং প্রতিদান ও শাস্তির নমুনাও এখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে।

সারকথা এই যে, অবাধ্যদেরকে এসব আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে না যায়। পার্থিব জীবনেও তারা আযাবে পতিত হতে পারে— যেমন, পূর্ববর্তী উম্মতরা হয়েছে। যদি তা না হয়, তবে মৃত্যু কিংবা কেয়ামত পরবর্তী হিসাব তো অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু যে মানব সীমাবদ্ধ জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোতে সমগ্র বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করে, তারা এ জাতীয় বিষয়বস্তুতে বাহানাবাজির আশ্রয় নেয়। তারা পয়গম্বরদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণীকে কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা আখ্যা দিয়ে গা বাঁচিয়ে যায়। বিশেষ করে যখন প্রায় সব যুগেই এমন অবস্থাও সামনে আসে যে, অনেক মানুষ আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্যতা সত্ত্বেও ধনেজনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক ও সম্মান-মর্যাদা সব কিছুই তাদের করায়ত্ত রয়েছে। একদিকে এ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এবং অপরদিকে পয়গম্বরদের ভীতি-প্রদর্শন যখন তারা উভয়টিকে মিলিয়ে দেখে, তখন বাহানাবাজ মন ও শয়তান তাদেরকে এ শিক্ষাই দেয় যে, পয়গম্বরদের উক্তি একটি প্রতারণা ও কুসংস্কার প্রসূত ধারণা বৈ নয়।

এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলী এবং তাদের উপর প্রয়োগকৃত আইন বর্ণনা করেছেন। বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

অর্থাৎ, আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উম্মতের কাছে স্বীয় রসূল প্রেরণ করেছি। দু'ভাবে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। প্রথমে কিছু অভাব-অনটন ও কষ্টে ফেলে দেখা হয়েছে যে, কষ্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করে কি না। তারা যখন এ পরীক্ষায় ফেল করল এবং আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে আসা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করার পরিবর্তে তাতে আরও বেশী লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া হল। অর্থাৎ, তাদের জন্যে পার্থিব ভোগ-বিলাসের সব দ্বার খুলে দেয়া হল এবং পার্থিব জীবন সম্পর্কিত সবকিছুই তাদেরকে দান করা হল। আশা ছিল যে, তারা এ সব নেয়ামত দেখে নেয়ামতদাতাকে চিনবে এবং এভাবে তারা খোদাকে স্মরণ করবে। কিন্তু এ পরীক্ষায়ও তারা অকৃতকার্য হল। নেয়ামতদাতাকে চেনা ও তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা ভোগ-বিলাসের মোহে এমন মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ্ ও রসূলের বাণী ও শিক্ষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেল। উভয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর যখন তাদের ওযর-আপত্তির আর কোন ছিদ্র অবশিষ্ট রইল না, তখন আল্লাহ্ তাআলা অকস্মাৎ তাদেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন এবং এমন ভাবে নাস্তানাবুদ করে দিলেন যে, বংশে বাতি জ্বালাবারও কেউ অবশিষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর এ আযাব জলে-স্থলে— অন্তরীক্ষে বিভিন্ন পন্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে মিসমার করে দিয়েছে। নূহ (আঃ)-এর গোটা জাতিকে এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পর্বতের শৃঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি। আদ জাতির উপর দিয়ে উপর্যপরি আট দিন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি

প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি। সামূদ জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়। লূত (আঃ)–এর কওমের সম্পূর্ণ বস্তি উল্টে দেয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত জর্দান এলাকায় একটি অভ–তপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান। এ জলাশয়ে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি জীব-জন্তুও জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে 'বাহ্‌রে মাইয়্যেৎ' তথা 'মৃত সাগর' নামেও অভিহিত করা হয় এবং 'বাহরে লূত' নামেও।

মোটকথা, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার আযাবের আকারে অবতীর্ণ হয়েছে যাতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। কোন সময় তারা বাহ্যতঃ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরবর্তীতে তাদের নাম উচ্চারণকারীও কেউ অবশিষ্ট থাকেনি।

আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কোন জাতির প্রতি অকস্মাৎ আযাব নাযিল করেন না, বরং প্রথমে হুশিয়ারীর জন্যে অল্প শাস্তির অবতারণা করেন। এতে ভাগ্যবান লোক অসাবধানতা পরিহার করে বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করার সুযোগ পায়। আরও জানা গেল যে, ইহকালে সাজা হিসেবে যে কষ্ট ও বিপদ আসে, তা সাজার আকারে হলেও প্রকৃত সাজা তা নয়,বরং অসাবধানতা থেকে সজাগ করাই তার উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, এটি সাক্ষাৎ করুণা।

এসব আয়াত দ্বারাই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে, ইহকাল প্রতিদান জগৎ নয়, বরং কর্মজগৎ। এখানে সৎ–অসৎ, ভাল–মন্দ একই পাল্লায় ওজন করা হয় বরং অসৎ লোক সৎলোকদের চাইতে অধিক সুখে থাকে। অতএব, এ জগতে শাস্তি কার্যকর করার অর্থ কি? এ সন্দেহের উত্তর সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, আসল প্রতিদান ও শাস্তি কেয়ামতেই হবে। তাই কিয়মতের অপর নাম 'ইয়াওমুদ্দীন'; প্রতিদান দিবস। কিন্তু আযাবের নমুনা কিছু কষ্ট এবং ছোয়াবের নমুনা হিসেবে কিছু সুখ করুণাবশতঃ ইহজগতে প্রেরণ করা হয়। কোন কোন সাধক বলেছেন যে, এ জগতের সব সুখ ও আরাম জান্নাতের সুখেরই নমুনা, যাতে মানুষ জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যত কষ্ট. বিপদ ও দুঃখ রয়েছে, সব পরকালের শাস্তিরই নমুনা, যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। বলাবাহুল্য, নমুনা ব্যতীত কোন কিছুর প্রতি আগ্রহও সৃষ্টি করা যায় না এবং কোন কিছু থেকে ভীতি প্রদর্শনও করা যায় না।

আলোচ্য আয়াতের শেষ ভাগেও لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ বাক্যে এ তাৎপর্যটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শাস্তিদান নয়, বরং এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়। এতে বুঝা গেল যে, দুনিয়াতে আযাব হিসেবেও যে কষ্ট ও বিপদ কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়, তাতেও একদিক দিয়ে আল্লাহ্‌র রহমতই কার্যরত থাকে।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ
مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ
أَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ
كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ
أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾
وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ
لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

(৪৪) অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উম্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। (৪৫) অতঃপর জালেমদের মূল শিকড় কর্তিত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্যে, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। (৪৬) আপনি বলুন ঃ বল তো দেখি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে। (৪৭) বলে দিন ঃ দেখতো, যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি, আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, তবে জালেম, সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে? (৪৮) আমি পয়গম্বরদেরকে প্রেরণ করি না, কিন্তু সুসংবাদদাতা ও ভীতি-প্রদর্শকরূপে– অতঃপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংশোধিত হয়, তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৪৯) যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে আযাব স্পর্শ করবে। (৫০) আপনি বলুন ঃ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না? (৫১) আপনি এ কোরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না— যাতে তারা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এরপর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ, তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। অর্থাৎ, তাদের জন্যে দুনিয়ার নেয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দ্বার খুলে দেয়া হয়।

এতে সাধারণ মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না যে, তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে আছে এবং সফল জীবন যাপন করছে। অনেক সময় আযাবে পতিত অবাধ্য জাতিসমূহেরও এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে অকস্মাৎ কঠোর আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে।

তাই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তির উপর নেয়ামত ও ধন-দৌলতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে,. অথচ সে গোনাহ্ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নেবে, তাকে ঢিল দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, তার এ ভোগ-বিলাস কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস।— (ইবনে কাছীর)

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন জাতিকে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তাদের মধ্যে দুটি গুণ সৃষ্টি করে দেন— (এক) প্রত্যেক কাজে সমতা ও মধ্যবর্তিতা, (দুই) সাধুতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ, অসত্য বিষয় ব্যবহারে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন জাতিকে ধ্বংসে ও বরবাদ করতে চান, তাদের জন্যে বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্মসাতের দ্বার খুলে দেন। অর্থাৎ, বিশ্বাস ভঙ্গ ও কুকর্ম সত্ত্বেও তারা দুনিয়াতে সফল বলে মনে হয়।"

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র ব্যাপক আযাব আসার ফলে অত্যাচারীদের বংশ নির্মূল হয়ে গেল। এরই পর বলা হয়েছে ঃ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপরাধী ও অত্যাচারীদের উপর আযাব নাযিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্যে একটি নেয়ামত। এ জন্যে আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কোরাইশ কাফেরদেরকে তাদের বাসনা অনুযায়ী অন্য রকম মো'জেযাসমূহের মধ্যে কোন কোনটি আল্লাহ্ তাআলা প্রকাশ্যভাবে কার্যক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবী করেছিল। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযাটি শুধু কোরাইশরাই নয়, তৎকালীন বিশ্বের বহু লোক স্বচক্ষে দেখেছিল।

তাদের দাবী অনুযায়ী এমন বিরাট মো'জেযা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তারা কুফর ও পথভ্রষ্টতায় এবং জেদ ও হঠকারিতায় পূর্ববৎ অটল থেকে যায় এবং আল্লাহ্ তাআলার এ নির্দশনকে ان هذا الا سحر مستمر বলে উপেক্ষা করে। এসব বিষয় দেখা ও বোঝা সত্ত্বেও তারা প্রতিদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে নতুন নতুন মো'জেযা দাবী করত।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের প্রশ্ন ও দাবীর উত্তর একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে।

কাফেররা বিভিন্ন সময়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে তিনটি দাবী করেছিল। (এক) যদি আপনি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে থাকেন,

তবে মো'জেযার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ধনভাণ্ডার আমাদের জন্যে একত্রিত করে দিন। (দুই) যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য রসূল হয়ে থাকেন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উপকারী ও ক্ষতিকর অবস্থা ও ঘটনাবলী ব্যক্ত করুন যাতে আমরা উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করার এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো বর্জন করার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে নিতে পারি। (তিন) আমরা বুঝতে অক্ষম যে, আমাদেরই স্বগোত্রের একজন লোক, যিনি আমাদের মতই পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পানাহার ও বাজারে ঘুরাফেরা ইত্যাদি মানবিক গুণে আমাদের সম অংশীদার, তিনি কিরূপে আল্লাহ্‌র রসূল হতে পারেন! সৃষ্টি ও গুণাবলীতে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র কোন ফেরেশতা হলে আমরা তাঁকে আল্লাহ্‌র রসূল ও মানব জাতির নেতারূপে মেনে নিতাম।

উপরোক্ত তিনটি দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে ঃ'রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের বাজে প্রশ্নাদির উত্তরে আপনি বলে দিন ঃ তোমরা আমার কাছে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারও দাবী করছ, কিন্তু আমি কবে এ দাবী করলাম যে, আল্লাহ্ তাআলার সব ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত? তোমরা দাবী করছ যে, আমি ভবিষ্যতের সব উপকারী ও ক্ষতিকর ঘটনা তোমাদেরকে বলে দেই, আমি এ কথাও কবে বললাম যে, আমি সব অদৃশ্য বিষয় জানি? তোমরা আমার মধ্যে ফেরেশতা সুলভ গুণাবলী দেখতে চাও, আমি কবে এ দাবী করলাম যে, আমি ফেরেশতা?

মোটকথা, আমি যে বিষয় দাবী করি, তার প্রমাণই আমার কাছে চাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্‌র রসূল। তাঁর প্রেরিত নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছাই এবং নিজেও তা অনুসরণ করি, অপরকেও অনুসরণে উদ্‌বুদ্ধ করি। এর জন্যে একটি দু'টি নয়— অসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে।

রেসালত দাবী করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলার সব ধনভাণ্ডারের মালিক হওয়া, আল্লাহ্ তাআলারই মত প্রত্যেক ছোটবড় অদৃশ্য বিষয়ে অবগত হওয়া এবং মানবিক গুণের উর্ধ্বে কোন ফেরেশতা হওয়া মোটেই জরুরী নয়। রসূলের কর্তব্য এতটুকুই যে, তিনি আল্লাহ্ প্রেরিত ঐশীবাণী অনুসরণ করবেন; নিজেও তদনুযায়ী কাজ করবেন এবং অপরকেও কাজ করতে আহবান করবেন।

এ নির্দেশনামা দ্বারা এক দিকে রেসালতের প্রকৃত দায়িত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং অপরদিকে রসূল সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছিল, তাও দূর করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদেরকেও পথ নির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন খ্রীষ্টানদের মত রসূলকে খোদা না মনে করে বসে। রসূলের মাহাত্ম্য ও ভালবাসার দাবীও তাই। এ ব্যাপারে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মত বাড়াবাড়ি করা যাবে না। ইহুদীরা রসূলদের সম্মান হানিতে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে এবং খ্রীষ্টানরা সম্মানদানে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে আল্লাহ্ বানিয়ে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত নয়। এ ধনভাণ্ডার দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে ঃ সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ অনেক জিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোরআন স্বয়ং ধনভাণ্ডার প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছে ঃ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ অর্থাৎ, দুনিয়াতে এমন কোন বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। এতে বুঝা যায়, ভাণ্ডার বলে দুনিয়ার সব বস্তুকেই বুঝানো হয়েছে; এতে কোন বিশেষ বস্তুকে নির্দিষ্ট করা যায় না। অবশ্য তফসীরবিদগণ যেসব নির্দিষ্ট বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, তাও দৃষ্টান্ত স্বরূপই উল্লেখ করেছেন। কাজেই এতে কোন মতবিরোধ নেই। এ আয়াতে যখন বলা হয়েছে যে, খোদায়ী ভাণ্ডার পয়গম্বরকুল-শিরোমণি হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর হাতেও নেই, তখন উম্মতের কোন ওলী অথবা বুযুর্গ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, যাকে যা ইচ্ছা দিতে পারেন—সুস্পষ্ট মূর্খতা বৈ কিছু নয়।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি ফেরেশতা, যে কারণে তোমরা আমার মানবিক গুণ দেখে রেসালতে অস্বীকার করবে।

মধ্যবর্তী কথায় বাক্যে ভঙ্গি পরিবর্তন করে لااقول لكم انى اعلم الغيب বলার পরিবর্তে وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, 'আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি অদৃশ্য বিষয় জানি। একথা না বলে 'আমি অদৃশ্য বিষয় জানি না' বলা হয়েছে।

তফসীর বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়্যান এরূপ বলার একটি সূক্ষ্ম কারণ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, খোদায়ী ভাণ্ডারের মালিক হওয়া না হওয়া এবং কোন ব্যক্তির ফেরেশতা হওয়া না হওয়া এগুলো প্রত্যক্ষ বিষয়। কাফেররাও জানত যে, আল্লাহ্ তাআলার সব ভাণ্ডার রসূলের হাতে নেই এবং তিনি ফেরেশতাও নন। তারা শুধু হঠকারিতাবশতঃ এসব দাবী করত। কাজেই কাফেরদের এসব কথার উত্তরে একথা বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল যে, আমি আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারের মালিক হওয়া এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবী কখনও করিনি।

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি তারা জেদ পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করে আসল কাজে অর্থাৎ রেসালত প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন। যারা কেয়ামতে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিতি ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন। যেমন, মুসলমান কিংবা যারা কমপক্ষে এসব বিষয় অস্বীকার করে না, আর কিছু না হোক, কমপক্ষে তারা হিসাবের আশঙ্কা করে।

মোটকথা এই যে, কেয়ামত সম্পর্কে তিন প্রকার লোক রয়েছে (এক) কেয়ামতে নিশ্চিত বিশ্বাসী, (দুই) অনিশ্চিত বিশ্বাসী এবং (তিন) সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। এ তিন প্রকার লোককেই ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ নবী-রসূলগণকে দেয়া হয়েছে। কোরআনের অনেক আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই প্রকার লোক ভীতি প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হবে বলে বেশী আশা করা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্‌র কাছে একত্রিত হওয়ার আশঙ্কা করে, তাদেরকে কোরআন দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করুন।

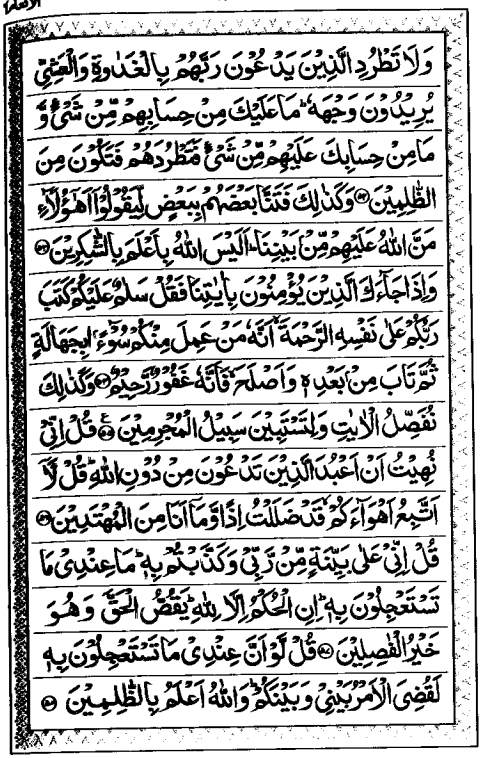

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَ
مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ
الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ
مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ
رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ
ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَكَذَٰلِكَ
نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾ قُلْ إِنِّي
نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ قُل لَّا
أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾
قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ
خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

(৫২) আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালনকর্তার এবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব বিন্দুমাত্রও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিতাড়িত করবেন। নতুবা আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। (৫৩) আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি— যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন? (৫৪) আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিন : তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পালনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর এরপরে তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৫৫) আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি— যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। (৫৬) আপনি বলে দিন : আমাকে তাদের এবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের এবাদত কর। আপনি বলে দিন : আমি তোমাদের খুশীমত চলবো না। কেননা, তাহলে আমি পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব না। (৫৭) আপনি বলে দিন : আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ আছে এবং তোমরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছ। তোমরা যে বস্তু শীঘ্র দাবী করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (৫৮) আপনি বলে দিন : যদি আমার কাছে তা থাকত, যা তোমরা শীঘ্র দাবী করছ, তবে আমার ও তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ কবেই চুকে যেত। আল্লাহ্ জালেমদের সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মান-অপমানের ইসলামী মাপকাঠি : ইসলামে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য নেই : যারা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মনুষত্ব কাকে বলে তা জানে না, বরং মানুষকে জগতের বিভিন্ন জানোয়ারের মধ্যে এমন একটি সজ্ঞান জানোয়ার মনে করে, যে অন্য জানোয়ারদেরকে অধীনস্ত ও প্রভাবাধীন করে স্বীয় সেবাদাসে পরিণত করেছে, তাদের মতে জীবনের লক্ষ্য পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ ও অন্যান্য জৈবিক অনুভূতিতে ব্যবহার করা ছাড়া আর কিইবা হতে পারে? জীবনের লক্ষ্য যখন শুধু তাই হয়, তখন জগতে ভাল-মন্দ, ছোট-বড়, সম্মানিত ও অপমানিত, ভদ্র ও ইতর পরিচয়ের মাপকাঠি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, যার কাছে পানাহার ও ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্য রয়েছে, সেই কৃতকর্মা, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং যার কাছে এসব বস্তু স্বল্পমাত্রায় আছে সে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও অকৃতকর্মা।

সত্য বলতে কি, এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত হওয়ার জন্যে সচ্চরিত্র ও সৎকর্মের কোন প্রয়োজনই নেই, বরং যে কর্ম ও চরিত্র এ জৈবিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক, তাই সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রতা।

এ কারণেই নবী-রসূলগণের এবং তাদের আনীত ধর্মের সর্ব প্রথম ও সর্বশেষ শিক্ষা ছিল এই যে, এ জীবনের পর আরেকটি চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন রয়েছে, সে জীবনের সুখশান্তি যেমন পূর্ণ ও চিরস্থায়ী, তেমনি কষ্ট, শাস্তি ও চিরস্থায়ী। পার্থিব জীবন স্বয়ং লক্ষ্য নয়, বরং পর জীবনে যে যে বিষয় উপকারী, তা সংগ্রহে ব্যস্ত থাকাই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আসল লক্ষ্য।

মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জন্তু-জানোয়ারকে পর জীবনের চিন্তা করতে হয় না, কিন্তু জ্ঞানী ও সচেতন ব্যক্তিদের মতে পরজীবনের সংশোধনই মানুষের সর্ববৃহৎ চিন্তা। এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্রতা ও নীচতা এবং সম্মান ও অপমানের মাপকাঠি অধিক পানাহার কিংবা অধিক ধন-সম্পদ আহরণ হবে না, বরং সচ্চরিত্রতা ও সৎকর্মই হবে আভিজাত্যের এক মাত্র মাপকাঠি। পরকালের সম্মান এগুলোর উপরই নির্ভরশীল।

জগদ্বাসী যখনই নবী-রসূলগণের নির্দেশাবলী, শিক্ষা এবং পরকাল-বিশ্বাসের প্রতি অমনোযোগী হয়েছে, তখনই তার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিও সামনে এসে গেছে— অর্থাৎ, শুধু অন্ন ও উদরই মান-অপমান, ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হয়েছে। যারা এতে সফলকাম তারা ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত হয়েছে এবং যারা এতে ব্যর্থ কিংবা অসম্পূর্ণ, তারা দরিদ্র, সম্মানহীন, নীচ ও লাঞ্ছিত বলে পরিগণিত রয়েছে।

তাই সর্বকালে শুধু পার্থিব জীবনের গোলক ধাঁধায় আবদ্ধ মানুষ বিত্তবানদেরকে সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং দীন-দরিদ্র বিত্তহীনদেরকে সম্মানহীন ও নীচ বলে গণ্য করেছে। এ মাপকাঠির ভিত্তিতেই হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম বিশ্বাস স্থাপনকারী দরিদ্রদেরকে নীচ বলে আখ্যা দিয়ে বলেছিল : আমরা এ নীচদের সাথে একত্রে বসতে পারি না। আপনি যদি আমাদেরকে কোন পয়গাম শুনাতে চান, তবে দরিদ্র ও নিঃস্বদেরকে আগে দরবার থেকে বহিষ্কার করুন।

মহানবী (সাঃ)-এর আমলে আবারও এ প্রশ্নই দেখা দেয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এরই উত্তর বিশেষ নির্দেশসহ উল্লেখিত হয়েছে।

ইবনে কাছীর ইমাম ইবনে জরীরের বাচনিক বর্ণনা করেন যে, ওতবা, শায়বা, ইবনে-রবিয়া, মুতএম ইবনে আদী, হারেছ ইবনে নওফেল প্রমুখ

কতিপয় কোরাইশ সর্দার মহানবী (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেবের নিকট এসে বলল ঃ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ (সাঃ)-এর কথা মেনে নিতে আমাদের সামনে একটি বাধা এই যে, তার চার পাশে সর্বদা এমন সব লোকের ভিড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, এরপর আমরা মুক্ত করে দিয়েছি, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণায় যারা লালিত-পালিত হতো। এমন নিকৃষ্ট লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তার মজলিসে যোগদান করতে পারি না। আপনি তাকে বলে দিন, যদি সে আমাদের আসার সময় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেয়, তবে আমরা তার কথা নিয়ে বিবেচনা করতে সম্মত রয়েছি।

আবু তালেব মহানবী (সাঃ)-কে তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিলে হযরত ওমর (রাঃ) মত প্রকাশ করে বললেন ঃ এতে অসুবিধা কি? আপনি কিছুদিন তাই করে দেখুন। এরা তো অকপট বন্ধুবর্গই। কোরাইশ সর্দারদের আগমনের সময় এরা না হয় সরেই যাবে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে উল্লেখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আয়াত অবতরণের পর হযরত ফারূকে আজম (রাঃ)-কে 'আমার মত ভ্রান্ত ছিল'— এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

যে দরিদ্রদের সম্পর্কে আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে, তাঁরা ছিলেন হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ), ছোহায়েব রুমী (রাঃ), আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ), আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম (রাঃ), উসায়েদের মুক্ত ক্রীতদাস ছবীহ্ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ), মেকদাদ ইবনে আমর (রাঃ), মসউদ ইবনুল ক্বারী (রাঃ), যুশ-শিমালাইন (রাঃ) প্রমুখ সাহারায়ে কেরাম। তাঁদের সম্মান ও ভদ্রতার সনদ আল্লাহ্র তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

কতিপয় নির্দেশ ঃ উল্লিখিত আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ বোঝা যায়— প্রথমতঃ কারও ছিন্নবস্ত্র কিংবা বাহ্যিক দুরবস্থা দেখে তাকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করার অধিকার কারও নেই। প্রায়ই এ ধরনের পোশাকে এমন লোকও থাকেন, যারা আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ অনেক দুর্দশাগ্রস্ত, ধূলি-ধূসরিত লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্র প্রিয় তারা যদি কোন কাজের আবদার করে বলে বসেন, 'এরূপ হবে' তবে আল্লাহ্ তাআলা তাদের সে আবদার অবশ্যই পূর্ণ করেন।'

দ্বিতীয়তঃ শুধু পার্থিব ধন-দৌলতকে ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি মনে করা মানবতার অবমাননা। এর প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম।

তৃতীয়তঃ কোন জাতির সংস্কারক ও প্রচারকের জন্যে ব্যাপক প্রচারকার্যও জরুরী। অর্থাৎ, পক্ষ-বিপক্ষ, মান্যকারী ও অমান্যকারী সবার কাছেই স্বীয় বক্তব্য প্রচার করতে হবে। কিন্তু যারা তার শিক্ষার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তা পালন করে চলবে, তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। অন্যের কারণে তাদেরকে পেছনে ফেলা কিংবা উপেক্ষা করা জায়েয নয়। উদাহরণতঃ অমুসলমানদের মধ্যে প্রচার কার্যের জন্যে অজ্ঞ মুসলমানদের শিক্ষাদান ও সংশোধনকে পিছনে ফেলে দেয়া উচিত নয়।

চতুর্থতঃ, আল্লাহ্র নেয়ামত কৃতজ্ঞতার অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি খোদায়ী নেয়ামতের আধিক্য কামনা করে, কথায় ও কাজে কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা তার পক্ষে অপরিহার্য।

এবার আয়াতসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেখুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

অর্থাৎ, আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে, এমন লোক যখন আপনার কাছে আসে (এখানে آيات —এর অর্থ কোরআনের আয়াতও হতে পারে এবং আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও কুদরতের সাধারণ নিদর্শনাবলীও হতে পারে।) তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে سَلَامٌ عَلَيْكُمْ বলে সম্বোধন করুন। এখানে سَلَامٌ عَلَيْكُمْ —এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে ঃ (এক) তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার সালাম পৌঁছিয়ে দিন, যাতে তাদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান বোঝা যায়। এতে করে ঐসব দরিদ্র মুসলমানের মনোবেদনার চমৎকার প্রতিকার হয়ে গেছে, যাদেরকে মজলিস থেকে হটিয়ে দেয়ার প্রস্তাব কোরাইশ সর্দাররা করেছিল। (দুই) আপনি তাদেরকে নিরাপত্তার সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের ভুলত্রুটি হয়ে থাকলেও তা ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তারা সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ —বাক্যে এ অনুগ্রহের উপর আরও অনুগ্রহ ও নেয়ামত দানের ওয়াদা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মুসলমানদেরকে বলে দিন ঃ তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। কাজেই খুব ভীত ও অস্থির হয়ো না। এ বাক্যে প্রথমতঃ رب (প্রতিপালক) শব্দ ব্যবহার করে আয়াতের বিষয়বস্তুকে যুক্তিযুক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের প্রতিপালক। এখন জানা কথা যে, কোন প্রতিপালক স্বীয় পালিতদেরকে বিনষ্ট হতে দেন না। অতঃপর رب শব্দটি যে দয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল, তা পরিষ্কারভাবেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাও এমন ভঙ্গিতে যে, তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন। কাজেই কোন ভাল ও সৎ লোকের দ্বারাই যখন ওয়াদা খেলাফী হতে পারে না, তখন রাব্বুল আলামীনের দ্বারা তা কেমন করে হতে পারে? বিশেষ করে যখন ওয়াদাটি চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করে নেয়া হয়।

সহীহ্ বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তাআলা সব কিছু সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেকের ভাগ্যের ফয়সালা করলেন, তখন একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে আরশে রেখে দিলেন। তাতে লেখা আছে ঃ ان رحمتى غلبت على غضبى —অর্থাৎ, আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়ে গেছে।

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন ঃ আমি তওরাতে লিখিত দেখেছি, যখন আল্লাহ্ তাআলা আসমান, যমিন ও এতদুভয়ের সবকিছু সৃষ্টি করলেন, তখন 'রহমত' (দয়া) গুণটিকে একশ' ভাগ করে একভাগ সমগ্র সৃষ্টজীবকে দান করলেন। মানুষ, জীবজন্তু ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দয়ার যেসব লক্ষণ দেখা যায়, তা ঐ এক ভাগেরই ক্রিয়া। পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে, ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে এবং প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যে পারস্পরিক সহানুভূতি, ভালবাসা ও দয়া পরিলক্ষিত হয়, তা ঐ একভাগ দয়ারই ফলশ্রুতি। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ দয়া আল্লাহ্ তাআলা নিজের জন্যে রেখেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে একে নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই অনুমান করা যায় যে, সৃষ্টজীবের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার দয়া কিরূপ ও কতটুকু!

আর তিনি অত্যন্ত দয়ালু। অর্থাৎ, ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হবেন না, বরং নেয়ামতও দান করবেন।

আয়াতের 'অজ্ঞতা' শব্দ দ্বারা বাহ্যতঃ কেউ ধারণা করতে পারে যে, গোনাহ্ ক্ষমা করার ওয়াদা একমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অজ্ঞতাবশতঃ কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, জেনেশুনে গোনাহ্ করলে হয়তো এ ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা, এস্থলে 'অজ্ঞতা' বলে অজ্ঞতার কাজ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এমন কাজ করে বসে, যা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তিই করে। এর জন্যে বাস্তবে অজ্ঞ হওয়া জরুরী নয়। স্বয়ং – جهالت (অজ্ঞতা) শব্দেই এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে جهل শব্দের পরিবর্তে جهالت – এর ব্যবহার সম্ভবতঃ এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই করা হয়েছে। কেননা, جهل শব্দটি علم (জ্ঞান) এর বিপরীত এবং جهالت শব্দটি حلم ووقار (সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য)-এর বিপরীত। অর্থাৎ, جهالت শব্দটি বাকপদ্ধতিতে 'কার্যগত অজ্ঞতার' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যখনই কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, তা কার্যগত অজ্ঞতার কারণেই হয়। তাই কোন কোন বুযুর্গ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে অজ্ঞ। এখানে কার্যগত অজ্ঞতাই বোঝানো হয়েছে। এর জন্যে অজ্ঞান হওয়া জরুরী নয়। কেননা, কোরআন পাক ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তওবা দ্বারা প্রত্যেক গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়– অমনোযোগিতা ও অজ্ঞতাবশতঃ হোক কিংবা জেনেশুনে মানসিক দুর্মতি ও প্রবৃত্তির তাড়নাবশতঃ হোক।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে দু'টি শর্তাধীনে গোনাহগারদের সম্পর্কে ক্ষমা ও রহমতের ওয়াদা করা হয়েছে (এক) তওবা অর্থাৎ, গোনাহ্র জন্য অনুতপ্ত হওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে انما التوبة الندم —অর্থাৎ, অনুশোচনার নামই হল তওবা।

(দুই) ভবিষ্যতের জন্য আমল সংশোধন করা। কয়েকটি বিষয় এ আমল সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে এ পাপ কাজের নিকটবর্তী না হওয়ার সংকল্প করা ও সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং কৃত গোনাহ্র কারণে কারও অধিকার নষ্ট হয়ে থাকলে যথাসম্ভব তা পরিশোধ করা, তা আল্লাহ্র অধিকার হোক কিংবা বান্দার অধিকার। আল্লাহ্র অধিকার যেমন, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ফরয কর্মে ত্রুটি করা। আর বান্দার অধিকার— যেমন, কারও অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে করায়ত্ত করা ও ভোগ করা, কারও ইজ্জত-আবরু নষ্ট করা, কাউকে গালি-গালাজের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন প্রকারে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি।

তাই তওবার পূর্ণতার জন্যে যেমন অতীত গোনাহ্র জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, ভবিষ্যতের জন্যে কর্ম-সংশোধন করা এবং গোনাহ্র নিকটবর্তী না হওয়া জরুরী, তেমনিভাবে যেসব নামায ও রোযা অমনোযোগিতাবশতঃ তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাযা করা, যে যাকাত দেয়া হয়নি, তা এখন দিয়ে দেয়া, হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করে থাকলে এখন তা আদায় করে নেয়া, নিজে করতে সক্ষম না হলে বদলী হজ্জ করানো প্রভৃতি বিষয়ও অপরিহার্য। যদি জীবদ্দশায় বদলী হজ্জ ও অন্যান্য কাযার পুরোপুরি সুযোগ না মিলে তবে ওছিয়ত করা, যাতে ওয়ারিশ ব্যক্তিরা তার ফরযসমূহের ফিদিয়া (বিনিময়) ও বদলী হজ্জের ব্যবস্থা করে। মোটকথা, কর্ম-সংশোধনের জন্যে শুধু ভবিষ্যৎ কর্ম-সংশোধন করাই যথেষ্ট নয়, বিগত ফরয ও ওয়াজেবসমূহ আদায় করাও জরুরী।

এমনিভাবে যদি কারও অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে হস্তগত করে থাকে, তবে তা ফেরৎ দিতে হবে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। কাউকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তারও ক্ষমা নিতে হবে। যদি ক্ষমা নেয়া সম্ভবপর না হয়— উদাহরণতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি মারা যায়, কিংবা তার ঠিকানা অজ্ঞাত হয়, তবে তার জন্যে নিয়মিতভাবে আল্লাহ্ তাআলার কাছে মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকবে। এতে আশা করা যায়, সে সন্তুষ্ট হবে এবং ঋণী ব্যক্তি ঋণ থেকে অব্যাহতি পাবে।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَ
يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ
ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ
فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۗ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ
مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ۗ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۟ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ
يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ
اَنْجٰىنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ
مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى
اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ
يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ
الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۗ قُلْ
لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾

(৫৯) তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। (৬০) তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলা কর, তা জানেন। অতঃপর তোমাদেরকে দিবসে সমুত্থিত করেন—যাতে নির্দিষ্ট ওয়াদা পূর্ণ হয়। (৬১) অনন্তর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমাদেরকে বলে দিবেন, যা কিছু তোমরা করছিলে। তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রবল। তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের কাছে রক্ষণাবেক্ষণকারী। এমন কি, যখন তোমাদের কারও মৃত্যু আসে তখন আমার প্রেরিত ফেরেশতারা তার আত্মা হস্তগত করে নেয় (৬২) অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছানো হবে। শুনে রাখ, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন। (৬৩) আপনি বলুন ঃ কে তোমাদেরকে স্থল ও জলের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেন, যখন তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ও গোপনে আহবান কর যে, যদি আপনি আমাদেরকে এ থেকে উদ্ধার করে নেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৬৪) আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দেন এবং সব দুঃখ-বিপদ থেকে। তথাপি তোমরা শেরক কর। (৬৫) আপনি বলুন ঃ তিনিই শক্তিমান যে, তোমাদের উপর কোন শাস্তি উপর দিক থেকে অথবা তোমাদের পদতল থেকে প্রেরণ করবেন অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখী করে দিবেন এবং একেকে অন্যের উপর আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন। দেখ, আমি কেমন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি—যাতে তারা বুঝে নেয়। (৬৬) আপনার সম্প্রদায় একে মিথ্যা বলছে, অথচ তা সত্য। আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের উপর নিয়োজিত নই। (৬৭) প্রত্যেক খবরের একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জেনে নিবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার অমোঘ ব্যবস্থাপত্র ঃ সারা বিশ্বে যত ধর্মমত প্রচলিত রয়েছে, তন্মধ্যে ইসলামের স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য ও প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে একত্ববাদে বিশ্বাস। বলাবাহুল্য, শুধু আল্লাহ্‌র সত্তাকে এক ও অদ্বিতীয় জানার নামই একত্ববাদ নয়, বরং পূর্ণত্বের যত গুণ আছে সবগুলোতেই তাঁকে একক ও অদ্বিতীয় মনে করা এবং তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুকে এসব গুণে অংশীদার ও সমতুল্য মনে না করাকে একত্ববাদ বলা হয়।

আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী হচ্ছে জীবন, জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য, শ্রবণ, দর্শন, বাসনা, ইচ্ছা, সৃষ্টি, অন্নদান ইত্যাদি। তিনি এসব গুণে এমন পরিপূর্ণ যে, কোন সৃষ্টজীব কোন গুণে তাঁর সমতুল্য হতে পারে না। এসব গুণের মধ্যেও দু'টি গুণ সব চাইতে বিখ্যাত। (এক) জ্ঞান এবং (দুই) শক্তি-সামর্থ্য। তাঁর জ্ঞান বিদ্যমান, অবিদ্যমান, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, ছোট, বড়, অণু-পরমাণু সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত এবং তাঁর শক্তি-সামর্থ্যও সবকিছুতেই পরিবেষ্টিত। উল্লেখিত দু'আয়াতে এ দু'টি গুণই বর্ণিত হয়েছে। এ দু'টি গুণ এমন যে, যে ব্যক্তি এগুলোর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এবং চিন্তায় উপস্থিত রাখে, তার পক্ষে গোনাহ্ ও অপরাধ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। বলাবাহুল্য, কথায় , কাজে, উঠায়-বসায় এমনকি প্রতি পদক্ষেপে যদি কারও চিন্তায় একথা উপস্থাপিত থাকে যে, একজন সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান তাকে দেখছেন এবং তার প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য এবং মনের ইচ্ছা ও কল্পনা পর্যন্ত জানেন তবে এ উপস্থিতি কখনও তাকে সর্ব শক্তিমানের অবাধ্যতার দিকে পা বাড়াতে দিবে না। তাই আলোচ্য আয়াত দু'টি মানুষকে পূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তার ক্রিয়াকর্ম ও চরিত্র সংশোধন করা ও সংশোধিত রাখার একটি অমোঘ ব্যবস্থাপত্র বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ – مفاتح শব্দটি বহুবচন। এর একবচন مفتح ও مفتح —উভয়টিই হতে পারে। مفتح —এর অর্থ ভাণ্ডার এবং مفتح অর্থ চাবি ঃ আয়াতে উভয় অর্থ হওয়ার অবকাশ আছে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ ও অনুবাদক مفاتح —এর অনুবাদ করেছেন ভাণ্ডার, আবার কেউ কেউ অনুবাদ করেছেন চাবি। উভয় অনুবাদের সারকথা এক। কেননা, 'চাবির মালিক' বলেও 'ভাণ্ডারের মালিক' বোঝানো যায়।

কোরআনের পরিভাষায় অদৃশ্যের জ্ঞান ও অসীম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র ঃ غيب শব্দ দ্বারা এমন বস্তু বোঝানো হয়, যা অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা কাউকে সে বিষয়ে অবগত হতে দেননি।—(মাযহারী)

প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐসব অবস্থা ও ঘটনা, যা কেয়ামতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিংবা সৃষ্ট জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদাহরণতঃ কে কখনও কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কি কি কাজ করবে, কতটুকু বয়স পাবে, কতবার শ্বাস গ্রহণ করবে, কতবার পা ফেলবে, কোথায় মরবে, কোথায় সমাধিস্থ হবে এবং কে কতটুকু রিযিক পাবে, কখন পাবে, বৃষ্টি কখন, কোথায় কি পরিমাণ হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্ত ঐ ভ্রূণ, যা স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে, কিন্তু কারও জানা নেই যে, পুত্র না কন্যা, সুশ্রী না কুশ্রী, সৎস্বভাব না বদস্বভাব। এমনি ধরনের আরও যেসব বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে

সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে উহ্য রয়েছে।

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ – এর অর্থ এই দাঁড়াল যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ মালিকানায় ও করায়ত্ত থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান তাঁর করায়ত্ত এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা অর্থাৎ, কখন কতটুকু অস্তিত্ব লাভ করবে —তাও তাঁর সামর্থ্যের অন্তর্গত। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ

অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ পরিমাণে অবতীর্ণ করি।

মোটকথা এই যে, এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার নজিরবিহীন জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠাও প্রমাণিত হয়েছে এবং সামর্থ্যগত পরাকাষ্ঠাও। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জ্ঞান ও সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার বৈশিষ্ট্য। এ গুণ অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী عنده শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী বাক্যে এ ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট উক্তিতে রূপান্তরিত করে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যে বলা হয়েছে ঃ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ —অর্থাৎ, অদৃশ্য বিষয়ের এসব ভাণ্ডার সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ অবহিত নয়।

তাই এ বাক্য দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে ঃ (এক) আল্লাহ্ তাআলার পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ের উপর সামর্থ্যবান হওয়া এবং (দুই) তাঁকে ছাড়া অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর এরূপ জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জিত না হওয়া।

কোরআনের পরিভাষায় غيب শব্দের অর্থ পূর্বে তফসীরে মাযহারীর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যেসব বিষয় এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা অস্তিত্ব লাভ করলেও কোন সৃষ্টজীব সে সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেনি। এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখলে অদৃশ্য বিষয়ের প্রশ্নে জনসাধারণের মনে বাহ্যদৃষ্টিতে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয়, তা আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু غيب শব্দ দ্বারা মানুষ সাধারণতঃ আভিধানিক অর্থ বুঝে। ফলে যে বস্তু আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে, তাকেও সাধারণ মানুষ غيب বলে দেয়, যদিও অন্যদের কাছে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপকরণাদি বিদ্যমান থাকে। এর ফলে নানাবিধ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। উদাহরণতঃ জ্যোতি বিদ্যা, ভবিষ্যৎকথন বিদ্যা, গণনবিদ্যা কিংবা হস্ত-রেখা বিদ্যা দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জ্ঞান অর্জন করা হয় অথবা 'কাশফ ও এলহাম' (আল্লাহ্ প্রকাশিত সত্য স্বর্গীয় প্রেরণা) দ্বারা কেউ কেউ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জেনে ফেলে অথবা মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি দেখে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যৎদ্বাণী করে এবং তা অনেকাংশে সত্যেও পরিণত হয়— এসব বিষয় জনসাধারণের দৃষ্টিতে 'এলমে গায়ব' তথা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান। তাই আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোরআন পাক 'এলমে-গায়ব'-কে আল্লাহ্ তাআলার বৈশিষ্ট্য বলেছে, অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, অন্যরাও তা অর্জন করতে পারে।

উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তাআলা 'কাশফ্ ও এলহামের' মাধ্যমে যদি কোন বান্দাকে কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে দেন, তবে কোরআনের পরিভাষায় তাকে 'এলমে গায়ব' বলা যায় না। এমনিভাবে উপকরণ ও যন্ত্রাদির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, তাও কোরআনী পরিভাষা অনুযায়ী 'এলমে-গায়ব' নয়, যেমন আবহাওয়া বিভাগের খবর কিংবা নাড়ি দেখে রোগীর শারীরিক অবস্থা বলে দেয়া। কারণ, আবহাওয়া বিভাগ কিংবা কোন হাকীম-ডাক্তার এসব খবর দেয়ার সুযোগ তখনই পায়, যখন এসব ঘটনার উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়। তবে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় না। যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় কিন্তু জনসাধারণ অজ্ঞ থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সবার দৃষ্টিতেই ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। এ কারণেই আবহাওয়া বিভাগ একমাস দু'মাস পর যে বৃষ্টি হবে, তার খবর আজ দিতে পারে না। কেননা, এখনও পর্যন্ত এ বৃষ্টির উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়নি। এমনিভাবে কোন হাকীম -ডাক্তার আজ নাড়ী দেখে বৎসর-দুই বছর পূর্বে কিংবা পরে সেবনকৃত ওষুধ কিংবা পথ্যের সন্ধান দিতে পারে না। কারণ, স্বভাবতঃ এর কোন ক্রিয়া নাড়ীতে থাকে না।

মোটকথা, চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখেই এসব বিষয়ের অস্তিত্বের খবর দেয়া হয়। লক্ষণাদি ও উপকরণ প্রকাশ পাওয়ার পর আর সেগুলো অদৃশ্য বিষয় থাকে না, বরং প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়। তবে সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না; শক্তিশালী হয়ে উঠার পরই সবার চোখে ফুটে উঠে।

এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সবকিছু সত্ত্বেও অনুমানের অতিরিক্ত কিছু নয়। এল্‌ম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা এগুলোর কোনটির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না। তাই এসব খবর ভ্রান্ত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা এল্‌ম বটে, কিন্তু 'গায়ব' নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পাঁচটা একচল্লিশ মিনিটে সূর্যোদয় হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হবে। বলাবাহুল্য, একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর গতি হিসাব করে সময় নির্দিষ্ট করা এমনই যেমন আমরা কোন রেলগাড়ী কিংবা উড়োজাহাজের স্টেশনে কিংবা বিমান বন্দরে পৌঁছার খবর দিয়ে দেই। এছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে খবর জানার যে দাবী করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। একশটি মিথ্যার ভিতর থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসা আদৌ পাণ্ডিত্য নয়।

গর্ভস্থ ভ্রূণ পুত্র না কন্যা, এ সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করতে ছাড়ে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এটিও নিছক অনুমান ছাড়া কিছু নয়। শতকরা দু'চার ক্ষেত্রে নির্ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কোন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

এক্সরে মেশিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিল, এবার এর মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তান পুত্র কি কন্যা জানা যাবে। কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এক্ষেত্রে এক্সরে যন্ত্রপাতিও ব্যর্থ।

মোটকথা, কোরআনের পরিভাষায় যাকে 'গায়ব' বা অদৃশ্য বলা হয়, তা আল্লাহ্ ছাড়া কারও জানা নেই। পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ স্বভাবতঃ যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তা প্রকৃত পক্ষে 'গায়ব' নয়; যদিও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না পাওয়ার দরুন তাকে 'গায়ব' বলেই অভিহিত করা হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খোদায়ী জ্ঞান ও অপার শক্তির কয়েকটি নমুনা ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা এবং নজিরবিহীন বিস্তৃতি বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এতদুভয়ের কয়েকটি চিহ্ন ও নমুনা বর্নিত হচ্ছে।

প্রথম আয়াতে ظلمات শব্দটি ظلمة এর বহুবচন। অর্থ অন্ধকার। ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ – এর অর্থ স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহ। অন্ধকারের অনেক প্রকার রয়েছে ঃ রাত্রির অন্ধকার, মেঘমালার অন্ধকার, ধুলাবালির অন্ধকার, সমুদ্রের ঢেউ এর অন্ধকার ইত্যাদি সব প্রকার বোঝাবার জন্যে ظلمات শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে অন্ধকারও মানুষের জন্যে একটি নেয়ামত। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মানুষের কাজকর্ম আলো দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং অন্ধকার সব কাজকর্ম থেকে অকেজো করা ছাড়াও মানুষের অগণিত দুঃখ ও বিপদাপদের কারণ হয়ে যায়। তাই আরবদের বাক-পদ্ধতিতে ظلمة শব্দটি দুঃখ ও বিপদাপদের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতেও সাধারণ তফসীরবিদগণ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মুশরেকদেরকে হুঁশিয়ার ও তাদের ভ্রান্ত কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে যখনই তোমরা বিপদের সম্মুখীন হও এবং সব আরাধ্য দেব-দেবীকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্কে আহবান কর, কখনও প্রকাশ্যে বিনীতভাবে এবং কখনও মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ থেকে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, এর সাথে সাথে তোমরা এরূপ ওয়াদাও কর যে, আল্লাহ্ তাআলা যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করব, তাঁকেই কার্যনির্বাহী মনে করব, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করব না। কেননা, বিপদেই যখন কাজে আসে না, তখন তাদের পূজাপাট আমরা কেন করব? তাই আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, এমতাবস্থায় কে তোমাদেরকে বিপদ ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে? উত্তর নির্দিষ্ট ও জানা। কেননা, তারা এ স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন দেব-দেবী এ অবস্থায় তাদের কাজে আসেনি। তাই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, আপনিই বলে দিন ঃ একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই তোমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দিবেন, বরং অন্যান্য সব কষ্ট-বিপদ থেকে তিনি উদ্ধার করবেন। কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও যখন তোমরা বিপদ মুক্ত হয়ে যাও, তখন আবার শেরেকে লিপ্ত হয়ে পড় এবং দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ শুরু করে দাও। এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মারাত্মক মূর্খতা!

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে ঃ (এক) আল্লাহ্ তাআলা অপার শক্তি-সামর্থ্য; অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিতে তিনি পুরোপুরি সামর্থ্য। (দুই) সর্বপ্রকার বিপদাপদ, কষ্ট ও অস্থিরতা দূর করা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই করায়ত্ত এবং (তিন) একথা বাস্তব সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, আজীবন দেব-দেবীর পূজাকারীরাও যখন বিপদে পতিত হয়,. তখন একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকেই আহবান করে এবং তাঁর প্রতিই মনোনিবেশ করে।

শিক্ষণীয় ঃ মুশরেকদের এ কর্মপন্থা বিশ্বাসঘাতকতার দিক দিয়ে যতবড় অপরাধই হোক; কিন্তু বিপদে পড়ে একমাত্র আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করা ও সত্যকে স্বীকার করা মুসলমানদের জন্যে একটি শিক্ষার চাবুক বিশেষ। আমরা মুসলমান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বিপদের সময়ও তাঁকে স্মরণ করি না; বরং আমাদের সব জ্ঞান বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আমরা যদিও মূর্তি ও দেব-দেবীকে স্বীয় কার্যনির্বাহী মনে করি না, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম উপকরণ ও যন্ত্রপাতিও আমাদের কাছে দেব-দেবীর চাইতে কম নয়। এদের চিন্তায় আমরা এমনভাবে ডুবে আছি যে, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র অপার মহিমার প্রতি মনোযোগ দেয়ার অবসর আমাদের নেই।

বিপদাপদের আসল প্রতিকার ঃ আমরা প্রত্যেক অসুখে শুধু ডাক্তার ও ওষুধকে এবং প্রত্যেক ঝড়-তুফান-বন্যায় শুধু বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জামকে কার্যনির্বাহী মনে করে এমন মত্ত হয়ে পড়ি যে, স্রষ্টার কথা চিন্তাই করি না। অথচ কোরআন পাক বার বার সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে যে, পার্থিব বিপদাপদ সাধারণতঃ মানুষের কুকর্মের ফল এবং পারলৌকিক শাস্তির একটা অতি সাধারণ নমুনা। এসব বিপদাপদ মুসলমানদের জন্যে এক প্রকার রহমত। কারণ, বিপদাপদ দিয়েই অমনোযোগী মানুষকে সতর্ক করা হয়, যাতে তারা এখনও স্বীয় কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে যত্নবান হয় এবং পরকালের কঠোর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। এ বিষয়বস্তুটি বোঝানোর জন্যেই কোরআন পাক বলে ঃ

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে সামান্য শাস্তি আস্বাদন করাই পরকালের বড় শাস্তির পূর্বে –যাতে তারা অমনোযোগিতা ও মন্দকাজ থেকে ফিরে আসে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

অর্থাৎ, তোমাদেরকে যে বিপদাপদ স্পর্শ করে, তা তোমাদের কুকর্মের প্রতিফল। আল্লাহ্ তাআলা অনেক কুকর্ম ক্ষমা করে দেন।– (শূরা)

এ আয়াতের বর্ণনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ— কারও গায়ে কোন কাষ্ঠখণ্ডের সামান্য আঁচড় লাগলে কিংবা কারও কোথাও পদস্খলন ঘটলে কিংবা কারও রোগ-ব্যথা দেখা দিলে তা সবই কোন না কোন গোনাহের প্রতিফল মনে করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা অনেক গোনাহ্ ক্ষমাও করে দেন।

বায়যাভী (রহঃ) বলেন ঃ এর অর্থ এই যে, অপরাধী ও গোনাহ্গাররা যেসব রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তা সবই গোনাহের ফল। কিন্তু নিষ্পাপ ও পাপমুক্তদেরকে রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদের সম্মুখীন করার উদ্দশ্য তাদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরীক্ষা নেয়া এবং জান্নাতে তাদেরকে উচ্চস্তর মর্যাদা দান করা হয়ে থাকে।

এ থেকে আরও জানা যায় যে, সব বিপদাপদ, অস্থিরতা, দুর্ঘটনা ও সঙ্কটের আসল ও সত্যিকার প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, অতীত গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকতে কৃতসংকল্প হওয়া এবং বিপদ মুক্তির জন্যে আল্লাহ্র কাছেই দোয়া করা।

এর অর্থ এই নয় যে, বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম, ওষুধ-পত্র, চিকিৎসা এবং বিপদমুক্তির জন্য বস্তুগত কলা-কৌশল অনর্থক, বরং উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত কার্যনির্বাহী আল্লাহ্ তাআলাকেই মনে করতে হবে এবং বস্তুগত সাজ-সরঞ্জামকেও তাঁরই নেয়ামত মনে করে ব্যবহার করতে হবে। কেননা, সব সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তাঁরই সৃজিত এবং তাঁরই প্রদত্ত নেয়ামত। এগুলো তাঁরই নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুগামী হয়ে মানুষের সেবা করে।

মোটকথা এই যে, বিপদ মুহূর্তে মুশরেকরা আল্লাহ্‌কেই স্মরণ করে— এ ঘটনা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সব বিপদাপদ ও কষ্ট দূর করার জন্যে বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম ও কলা-কৌশলের চাইতে আল্লাহ্ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করাই মুমিনের কাজ। নতুবা এর পরিণতি যা হচ্ছে তাই হবে। অর্থাৎ, সব কলা-কৌশল সামগ্রিক হিসেবে উল্টো দিকে যাচ্ছে। বন্যা প্রতিরোধ ও তার ক্ষয়ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার সব কৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছে, কিন্তু বন্যা আসে এবং বার বার আসে। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করা হচ্ছে, কিন্তু রোগ-ব্যাধি রোজ রোজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করার জন্যে সর্ব প্রকার চেষ্টা চলছে এবং বাহ্যতঃ তা কার্যকরীও মনে হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক দিক দিয়ে এ পাগলা ঘোরা ছুটেই চলছে। চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ঘুষ, চোরা কারবার প্রভৃতি দমন করার জন্যে সব সরকারই বস্তুনিষ্ঠ কলা-কৌশল ব্যবহার করছে, কিন্তু হিসাব করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যহ এসব অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আফসোস! আজ ব্যক্তিগত ও বাহ্যতঃ লাভ-লোকসানের ঊর্ধ্বে উঠে অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে আমাদের বস্তুগত কলা-কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, বরং এগুলো আমাদের বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এর পর কোরআন বর্ণিত প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বস্তুগত কলা-কৌশলকেও তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত হিসেবে ব্যবহার করা। এছাড়া নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প পথ নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার সুবিস্তৃত জ্ঞান ও নজিরবিহীন শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক মানুষের বিপদাপদ তিনিই দূর করতে পারেন এবং বিপদ মুহূর্তে যে তাঁকে আহবান করে, সে তাঁর সাহায্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। কেননা, সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর তাঁর শক্তি-সামর্থ্য কামেল ও পরিপূর্ণ এবং সৃষ্টজীবের প্রতি তাঁর দয়াও অসাধারণ। তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এরূপ শক্তি-সামর্থ্য নেই এবং সমগ্র সৃষ্টজীবের প্রতিও দয়া-মমতা নেই।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের অপর পিঠ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যে কোন আযাব ও যে কোন বিপদ দূর করতে যেমন সক্ষম, তেমনিভাবে তিনি যখন কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে চান, তখন যে কোন শাস্তি দেয়া তাঁর পক্ষে সহজ। কোন অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্যে দুনিয়ার শাসনকর্তাদের ন্যায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দরকার হয় না এবং কোন সাহায্যকারীও প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়েও শক্তিমান যে, তোমাদের প্রতি উপর দিক থেকে কিংবা পদতল থেকে কোন শাস্তি পাঠিয়ে দেবেন কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরের মুখোমুখি করে দেবেন এবং এককে অপরের হাতে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন।

খোদায়ী শাস্তির তিনটি প্রকার ঃ এখানে তিন প্রকার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে ঃ (এক) – যা উপর দিক থেকে আসে, (দুই) যা নীচের দিক থেকে আসে এবং (তিন) যা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের আকারে সৃষ্টি হয়। عذابا শব্দটিকে تنوين সহ نكرة উল্লেখ করে ব্যাকরণের দিক দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ তিন প্রকারের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

তফসীরবিদগণ বলেন ঃ উপর দিক থেকে আযাব আসার দৃষ্টান্ত বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে অনেক রয়েছে। যেমন নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনাকারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, আ'দ জাতির উপর ঝড়ঝঞ্জা চড়াও হয়েছিল, লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল এবং বনী-ইসরাঈলের উপর রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি বর্ষণ করা হয়েছিল। আবরাহার হস্তীবাহিনী যখন মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন পক্ষীকুল দ্বারা তাদের উপর কঙ্কর বর্ষণ করা হয়। ফলে সবাই চর্বিত ভুষির ন্যায় হয়ে যায়।

এমনিভাবে বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে নীচের দিক থেকে আযাব আসারও বিভিন্ন প্রকার অতিবাহিত হয়েছে। নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি উপরের আযাব বৃষ্টির আকার এবং নীচের আযাব ভূতল থেকে পানি স্ফীত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তারা একই সময়ে উভয় প্রকার আযাবে পতিত হয়েছিল। ফেরআউনের সম্প্রদায়কে পদতলের আযাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কারণ, স্বীয় ধন-ভাণ্ডারসহ এ আযাবে পতিত হয়ে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদগণ বলেন ঃ উপরের আযাবের অর্থ অত্যাচারী বাদশাহ্ ও নির্দয় শাসকবর্গ এবং নীচের আযাবের অর্থ নিজ চাকর, নোকর ও অধীন কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতক, কর্তব্যে অবহেলাকারী ও আত্মসাৎকারী হওয়া।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কতিপয় উক্তি থেকেও উপরোক্ত তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। মেশকাত শরীফে এ উক্তি বর্ণিত রয়েছে ঃ كما تكونون يؤمر عليكم অর্থাৎ, তোমাদের কাজকর্ম যেমন ভাল কিংবা মন্দ হবে, তেমনি শাসক বর্গ তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। তোমরা সৎ ও আল্লাহ্‌র বাধ্য হলে তোমাদের শাসকবর্গও দয়ালু ও সুবিচারক হবে। পক্ষান্তরে তোমরা কুকর্মী হলে তোমাদের শাসকবর্গও নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হবে। প্রসিদ্ধ উক্তি عمالكم এর অর্থ তাই।

মেশকাতে উল্লেখিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

—আল্লাহ্ বলেন, আমি আল্লাহ্। আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি সব বাদশাহ্‌রও প্রভু। সব অন্তর আমার করায়ত্ত। আমার বান্দারা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি বাদশাহ্ ও শাসকদের অন্তরে তাদের প্রতি স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করেই দেই। পক্ষান্তরে আমার বান্দারা যখন আমার অবাধ্যতা করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরকে তাদের প্রতি কঠোর করে দেই। তারা তাদেরকে সব রকম নির্যাতন করে। তাই শাসকবর্গকে মন্দ বলে নিজের সময় নষ্ট করো না, বরং আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন ও স্বীয় কাজ কর্মসংশোধন কর— যাতে আমি তোমাদের

সবকাজ ঠিক করে দেই।

এমনিভাবে আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েয (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ

যখন আল্লাহ্ তাআলা কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার মঙ্গল চান, তখন তাকে উত্তম সহকারী দান করেন, যাতে প্রশাসক কোন ভুল করে ফেললে সে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সঠিক কাজ করলে সে তার সাহায্য করে। পক্ষান্তরে যখন কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার জন্যে অমঙ্গল অবধারিত হয়, তখন মন্দ লোকদেরকে তার পরামর্শদাতা ও অধীন করে দেয়া হয়।

এসব হাদীস ও আলোচ্য আয়াতের উল্লেখিত তফসীরের সারমর্ম এই যে, জনগণ শাসকবর্গের হাতে যেসব কষ্ট ও বিপদাপদ ভোগ করে, তা উপর দিককার আযাব এবং এসব কষ্ট অধীন কর্মচারীদের দ্বারা ভোগ করতে হয়, সেগুলো নীচের দিককার আযাব। এগুলো কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং খোদায়ী আইন অনুসারে মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি। হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ যখন আমি কোন গোনাহ্ করে ফেলি, তখন এর ক্রিয়া স্বীয় চাকর, আরোহণের ঘোড়া ও বোঝা বহনের গাধার মেজাজেও অনুভব করি। এরা সবাই আমার অবাধ্যতা করতে থাকে।

আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় প্রকার আযাব হচ্ছে ঃ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا —অর্থাৎ, তোমরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখী হয়ে যাবে এবং একদল অন্য দলের জন্যে আযাব হয়ে যাবে। এতে يلبسكم শব্দটি لبس ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ গোপন করা, আবৃত করা। এ অর্থেই لباس ঐ কাপড়কে বলে, যা মানুষের দেহকে আবৃত করে এবং এ কারণেই التباس সন্দেহ ও অস্পষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, যেখানে কোন বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ আবৃত ও অস্পষ্ট হয়।

شيع শব্দটি شيعة এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী ও অনুগামী। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ — অর্থাৎ, নূহ (আঃ)-এর অনুসারী হলেন ইবরাহীম (আঃ)। সাধারণে প্রচলিত ভাষা ও বাক-পদ্ধতিতে شيعة শব্দটি এমন দলকে বলা হয়, যারা কোন বিশেষ উদ্দেশে একত্রিত হয় এবং এ উদ্দেশে একে অন্যের সহায়ক হয়। অধুনা প্রচলিত ভাষায় এর স্বতঃস্ফূর্ত অনুবাদ হচ্ছে দল বা পার্টি।

তাই আয়াতের অনুবাদ এরূপ হবে ঃ এক প্রকার আযাব এই যে, জাতি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখী হয়ে যাবে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ

الا لاترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

—অর্থাৎ, তোমরা আমার পরে পুনরায় কাফের হয়ে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান মারতে শুরু করবে।— (মাযহারী)।

হযরত সায়ীদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেন ঃ একবার আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে চলতে চলতে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়লাম। অনেকক্ষণ দোয়া করার পর তিনি বললেন ঃ আমি পালনকর্তার কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি ঃ (এক) আমার উম্মতকে যেন নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ্ তাআলা এ দোয়া কবুল করেছেন। (দুই) আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা দ্বারা ধ্বংস করা না হয় আল্লাহ্ তাআলা এ দোয়াও কবুল করেছেন। (তিন) আমার উম্মত যেন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে ধ্বংস না হয়। আমাকে শেষ পর্যন্ত এরূপ দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।— (মাযহারী)

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। এতে তিনটি দোয়ার মধ্যে একটি এই যে, আমার উম্মতের উপর এমন শত্রুকে চাপিয়ে দিবেন না, যে সবাইকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। এ দোয়া কবুল হয়েছে। অপর দোয়া এই যে, তারা যেন পরস্পরে মারমুখী না হয়ে পড়ে। এরূপ দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মোহাম্মদীর উপর বিগত উম্মতদের ন্যায় আকাশ কিংবা ভূতল থেকে কোন ব্যাপক আযাব আগমন করবে না; কিন্তু একটি আযাব দুনিয়াতে তাদের উপরও আসতে থাকবে। এ আযাব হচ্ছে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দলীয় সংঘর্ষ। এ জন্যেই হযরত (সাঃ) অত্যন্ত জোর সহকারে উম্মতকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি প্রতি ক্ষেত্রে হুঁশিয়ার করেছেন যে, দুনিয়াতে যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি নেমে আসে, তবে তা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই আসবে।

সূরা হুদের এক আয়াতে এ বিষয় বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ —অর্থাৎ, তারা সর্বদা পরস্পরে মতবিরোধই করতে থাকবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম।

এতে বোঝা গেল যে, যারা পরস্পরে (শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া) মতবিরোধ করে, তারা আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত কিংবা দূরবর্তী।

এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে দলবদ্ধভাবে শক্ত করে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ে পড়ো না। অন্য এক আয়াতে আছে ঃ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا অর্থাৎ, যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না।

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ
مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾ وَذَرِ
الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ وَ
ذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ
وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ
كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ
يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ
وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
اتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ

(৬৮) যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না। (৬৯) এদের যখন বিচার করা হবে তখন পরহেযগারদের উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না; কিন্তু তাদের দায়িত্ব উপদেশ দান করা— যাতে ওরা ভীত হয়। (৭০) তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ স্বীয় কর্মে এমনভাবে গ্রেফতার না হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই এবং যদি তারা জগতের বিনিময়ও প্রদান করে, তবু তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। একাই স্বীয় কর্মে জড়িত হয়ে পড়েছে। তাদের জন্যে উত্তপ্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে— কুফরের কারণে। (৭১) আপনি বলে দিনঃ আমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুকে আহবান করব, যে আমাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না এবং আমরা কি পশ্চাৎপদে ফিরে যাব, এরপর যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন? ঐ ব্যক্তির মত, যাকে শয়তানরা বনভূমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে— সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। তার সহচররা তাকে পথের দিকে ডেকে বলছেঃ আস, আমাদের কাছে। আপনি বলে দিন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পথই সুপথ। আমরা আদিষ্ট হয়েছি যাতে স্বীয় পালনকর্তা আজ্ঞাবহ হয়ে যাই। (৭২) এবং তা এই যে, নামায কায়েম কর এবং তাঁকে ভয় কর। তাঁর সামনেই তোমরা একত্রিত হবে। (৭৩) তিনিই সঠিকভাবে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেনঃ হয়ে যা, অতঃপর হয়ে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বাতেল পন্থীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে কাজ নিজে করা গোনাহ্, সেই কাজ যারা করে, তাদের মজলিসে যোগদান করাও গোনাহ্। এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এর বিবরণ এরূপ ঃ

প্রথম আয়াতে يخوضون শব্দটি خوض থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পানিতে অবতরণ করা ও পানিতে চলা। বাজে ও অনর্থক কাজে প্রবেশ করাকেও خوض বলা হয়। কোরআন পাকে এ শব্দটি সাধারণতঃ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ এবং فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তাই خوض فى الايات এর অনুবাদ এ স্থলে 'ছিদ্রান্বেষণ' (অর্থাৎ, দোষ খোঁজাখুঁজি করা) কিংবা 'কলহ করা'— করা হয়েছে। অর্থাৎ, আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনাবলীতে শুধু ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্যে প্রবেশ করে এবং ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

এ আয়াতে প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) ও এর অন্তর্ভুক্ত আছেন এবং উম্মতের ব্যক্তিবর্গও। প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করাও সাধারণ মুসলমানদেরকে শুনানোর জন্যে। নতুবা তিনি এর আগেও কখনও এরূপ মজলিসে যোগদান করেননি। কাজেই কোন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না।

অতঃপর মিথ্যাপন্থীদের মজলিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কয়েক প্রকারে হতে পারে ঃ (এক) - মজলিস ত্যাগ করা, (দুই) - সেখানে থেকেও অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া— তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করা। কিন্তু আয়াতের শেষে যা বলা হয়েছে তাতে, প্রথম প্রকারই বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ, মজলিসে বসা যাবে না, সেখান থেকে উঠে যেতে হবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয় অর্থাৎ, ভুলক্রমে তাদের মজলিসে যোগদান করে ফেল— নিষেধাজ্ঞা স্মরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে স্বীয় মজলিসে আল্লাহ্‌র আয়াত ও রসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা তোমার স্মরণ ছিল না, তাই যোগদান করেছ। উভয় অবস্থাতে যখনই স্মরণ হয় তখনই মজলিস ত্যাগ করা উচিত। স্মরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গোনাহ্। অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি সেখানে বসে থাক, তবে তুমিও তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

ইমাম রাযী তফসীর-কবীরে বলেন ঃ এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গোনাহের মজলিস ও মজলিসের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এর উত্তম পন্থা হচ্ছে মজলিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া। কিন্তু মজলিস ত্যাগ করার মধ্যে যদি জান, মাল কিংবা ইজ্জতের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে সর্বসাধারণের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অন্য পন্থা অবললম্বন করাও জায়েয। উদাহরণতঃ অন্য কাজে ব্যাপৃত হওয়া এবং তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। কিন্তু বিশিষ্ট লোক ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাদের অনুকরণ করা হয়— তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় সেখান থেকে উঠে যাওয়াই সমীচীন।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ —অর্থাৎ, যদি

শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয়। এখানে সাধারণ মুসলমানের প্রতি সম্বোধন হয়ে থাকলে তাতে কোন আপত্তির বিষয় নেই। কেননা, ভুল করা ও বিস্মৃত হওয়া প্রত্যেক মানুষের অনিচ্ছাকৃতদোষ। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি যদি সম্বোধন হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ্র রসূলও যদি ভুল করেন এবং বিস্মৃত হন, তবে তাঁর শিক্ষার প্রতি আস্থা কিরূপে থাকতে পারে?

উত্তর এই যে, বিশেষ কোন রহস্য ও উপযোগিতার অধীনে নবীগণও (আঃ) ভুল করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে ওহীর মাধ্যমে তাঁদের ভুল সংশোধন করে দেয়া হতো। ফলে তাঁরা ভুলের উপর কায়েম থাকতেন না; তাই পরিণামে তাঁদের শিক্ষা ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

মোটকথা, আয়াতের এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, কেউ ভুলক্রমে কোন ভ্রান্ত কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তা মাফ করা হবে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ رفع عن امتى الخطأ وما استكرهوا عليه অর্থাৎ, আমার উম্মতকে ভুলভ্রান্তি ও বিস্মৃতির গোনাহ্ এবং যে কাজে অপরে জোরজবরদস্তির সাথে করায়, সেই কাজের গোনাহ্ থেকে অব্যাহতি দান করা হয়েছে।

ইমাম জাস্সাস আহ্কামুল-কোরআনে বলেন ঃ "আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যে মজলিসে আল্লাহ্, আল্লাহ্র রসূল কিংবা শরীয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় এবং তা বন্ধ করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি মজলিস বর্জন করা মুসলমানদের উচিত। হাঁ, সংশোধনের নিয়তে এরূপ মজলিসে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোন দোষ নাই।" আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ স্মরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করো না। এ থেকে ইমাম জাস্সাস মাসআলা চয়ন করেছেন যে, এরূপ অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধত লোকদের মজলিসে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গোনাহ্ ; তারা তখন কোন অবৈধ আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেরী লাগে না। কেননা, আয়াতে সর্বাবস্থায় জালেমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তখনও জুলুমে ব্যাপৃত থাকবে এরূপ কোন শর্ত আয়াতে নেই।

কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তুটি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ — অর্থাৎ, অত্যাচারীদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করো না। নতুবা তোমাদেরকেও জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, যদি সর্বাবস্থায় তাদের মজলিসে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে, তবে আমরা মসজিদে-হারামে নামায ও তওয়াফ থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাব। কেননা, তারা সর্বাদাই সেখানে বসে থাকে (এটি মক্কাবিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা) এবং ছিদ্রান্বেষণ ও কুভাষণ ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

অর্থাৎ, যারা সংযমী, তারা নিজের কাজে মসজিদে-হারামে গেলে দুষ্ট লোকদের কুকর্মের কোন দায়-দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে না। তবে তাদের কর্তব্য শুধু হক কথা বলে দেয়া। সম্ভবতঃ দুষ্টেরা এতে উপদেশ গ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে।

তৃতীয় আয়াতেও প্রায় একই বিষয়বস্তুর উপর আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا - এখানে ذر শব্দটি ذر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অসন্তুষ্ট হয়ে কোন কিছু পরিত্যাগ করা। আয়াতের অর্থ এই ঃ আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা স্বীয় ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুক করে রেখেছে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে ঃ (এক) তাদের জন্যে সত্য ধর্ম ইসলাম প্রেরিত হয়েছে; কিন্তু একে তারা ক্রীড়া ও কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং একে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। (দুই) তারা আসল ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুককেই ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। উভয় অর্থেরই সারমর্ম প্রায় এক।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا — অর্থাৎ, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। এটিই তাদের ব্যাধির আসল কারণ। অর্থাৎ, তাদের যাবতীয় লম্ফঝম্ফ ও ঔদ্ধত্যের আসল কারণই হচ্ছে এই যে, তারা ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা প্রলোভিত এবং পরকাল বিস্মৃত। পরকাল ও কেয়ামতের বিশ্বাস থাকলে তারা কখনও এসব কান্ড করত না।

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাধারণ মুসলমানদেরকে দু'টি নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ এক, উল্লেখিত বাক্যে বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধনাত্মকভাবে তাদেরকে কোরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং আল্লাহ্ তাআলার আযাবের ভয় প্রদর্শন করাও জরুরী।

আয়াতের শেষে আযাবের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে তারা স্বয়ং কুকর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আয়াতে اَنْ تُبْسَلَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং জড়িত হয়ে পড়া।

কোন ভুল কিংবা কারও প্রতি অত্যাচার করে বসলে তার সম্ভাব্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মানুষ দুনিয়াতে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে অভ্যস্ত। স্বীয় দলবল ব্যবহার করে অত্যাচারের প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। এতে ব্যর্থ হলে প্রভাবশালীদের সুপারিশ কাজে লাগায়। এতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা করে।

আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ্ অপরাধীকে যখন শাস্তি দেবেন, তখন সে শাস্তির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যে কোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এগিয়ে আসবে না, আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কারও সুপারিশ কার্যকর হবে না এবং কোন অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা হবে না। যদি কেউ সারা বিশ্বের অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয় এবং শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তা বিনিময় স্বরূপ দিতে চায়, তবুও এ বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ٧٣ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ
اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ٧٤
وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ
مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ٧٥ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا
رَبِّيْ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ٧٦ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا
قَالَ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ
مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ٧٧ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ
هٰذَآ اَكْبَرُ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ٧٨
اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ
اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٧٩ وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ
وَقَدْ هَدٰىنِ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا
وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ٨٠ وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ
اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ
سُلْطٰنًا فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٨١

তাঁর কথা সত্য। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (৭৪) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম পিতা আযরকে বললেন ঃ তুমি কি প্রতিমা সমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট। (৭৫) আমি এরূপভাবেই ইবরাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম– যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। (৭৬) অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বলল ঃ এটি আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল, তখন বলল ঃ আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। (৭৭) অতঃপর যখন চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখল, বলল ঃ এটি আমার প্রতিপালক। অনন্তর যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন বলল ঃ যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ-প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৭৮) অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক্ করতে দেখল, বললঃ এটি আমার পালনকর্তা, এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যেসব বিষয়কে শরীক কর, আমি ওসব থেকে মুক্ত। (৭৯) আমি একমুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরেক নই। (৮০) তাঁর সাথে তার সম্প্রদায় বিতর্ক করল। সে বলল ঃ তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ সম্পর্কে বিতর্ক করছ; অথচ তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন। তোমরা যাদেরকে শরীক কর, আমি তাদেরকে ভয় করি না— তবে আমার পালনকর্তাই যদি কোন কষ্ট দিতে চান। আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা কর না? (৮১) যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে রেখেছ, তাদেরকে কিরূপে ভয় কর, অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে শরীক করছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। অতএব, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি লাভের অধিক যোগ্য কে, যদি তোমরা জ্ঞানী হয়ে থাক।

অর্থাৎ, এরা ঐ সব লোক, যাদেরকে কুকর্মের শাস্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করার জন্যে দেয়া হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ পানি তাদের নাড়ীভুঁড়িকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এ পানি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে, তাদের কুফর ও অবিশ্বাসের কারণে।

এ শেষ আয়াত দ্বারা আরও জানা গেল যে, যারা পরকালের প্রতি অমনোযোগী হয়ে শুধু পার্থিব জীবন নিয়ে মগ্ন, তাদের সংসর্গও অপরের জন্যে মারাত্মক। তাদের সংসর্গে উঠা-বসাকারীরাও পরিণামে তাদের অনুরূপ আযাবে পতিত হবে।

উল্লেখিত আয়াত তিনটির সারমর্ম মুসলমানদেরকে অশুভ পরিবেশ ও খারাপ সংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। এটি যে কোন মানুষের জন্যেই বিষতুল্য। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য উক্তি ছাড়াও চাক্ষুস অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, অসৎ সমাজ ও মন্দ পরিবেশই মানুষকে কুকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত করে। এ পরিবেশে জড়িয়ে পড়ার পর মানুষ প্রথমতঃ বিবেক ও মনের বিরুদ্ধে কুকর্মে লিপ্ত হয়। এর পর আস্তে আস্তে কুকর্ম যখন অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন মন্দের অনুভূতিও লোপ পায়, বরং মন্দকে ভাল এবং ভালকে মন্দ মনে করতে থাকে। যেমন, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি প্রথমবার গোনাহ্ করে, তখন তার মানসপটে একটি কাল দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে কাল দাগ যেমন প্রত্যেকের কাছেই অপ্রীতিকর ঠেকে, তেমনি সে-ও গোনাহের কারণে অন্তরে অস্বস্তি অনুভব করে। কিন্তু যখন অব্যাহতভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোনাহ্ করে চলে এবং অতীত গোনাহ্‌র জন্যে তওবা না করে, তখন একের পর এক কাল দাগ পড়তে থাকে, এমনকি, নুরোজ্জ্বল মানসপট সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এর ফলশ্রুতিতে ভালমন্দের পার্থক্য থাকে না। কোরআন পাকে رَانَ শব্দ দ্বারা এ অবস্থাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ কুকর্মের কারণে তাদের অন্তরে মরচে পড়ে গেছে। ফলে ভালমন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতাই লোপ পেয়েছে।

চিন্তা করলে বুঝা যায়, অধিকাংশ ভ্রান্ত পরিবেশ ও অসৎ সঙ্গই মানুষকে এ অবস্থায় পৌঁছায়। نعوذ بالله منهم এ কারণেই অভিভাবকদের কর্তব্য ছেলেপেলেদেরকে এ ধরনের পরিবেশ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা।

পরবর্তী তিন আয়াতেও শিরকের খণ্ডন এবং একত্ববাদ ও পরকাল সপ্রমাণের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, যা অনুবাদ থেকেই বুঝা যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে মুশরেকদেরকে সম্বোধন এবং প্রতিমাপূজা ছেড়ে আল্লাহ্‌র আরাধনার আহ্বান বর্ণিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ আহ্বানকেই সমর্থন দান করা হয়েছে। এ ভঙ্গি স্বভাবগতভাবেই আরবদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সমগ্র আরবের পিতামহ। তাই গোটা আরব তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সর্বদা একমত ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটি তর্কযুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি প্রতিমাপূজা ও তারকা-পূজার বিপক্ষে স্বীয়

৩৯২

সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষা দান করেছিলেন।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তদীয় পিতা আযরকে বললেন ঃ তুমি স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছ। আমি তোমাকে এবং তোমার গোটা সম্প্রদায়কে পথ ভ্রষ্টতায় পতিত দেখতে পাচ্ছি।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম 'আযর'- বলেই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ তার নাম 'তারেখ' উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে 'আযর' তার উপাধি। ইমাম রাযী এবং কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী আলেম বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম 'তারেখ' এবং চাচার নাম 'আযর' ছিল। তাঁর চাচা আযর নমরূদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার পর মুশরেক হয়ে যায়। চাচাকে পিতা বলা আরবী বাকপদ্ধতিতে সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি। এ রীতি অনুযায়ী আয়াতে আযরকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা বলা হয়েছে। যরকানী 'মাওয়াহেব' গ্রন্থের টীকায় এর পক্ষে কয়েকটি সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করেছেন।

বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহ্বান ঃ আযর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা হোক কিংবা চাচা— সর্বাবস্থায় বংশগত দিক দিয়ে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে সত্য প্রচারের কাজ শুরু করেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ঃ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ —অর্থাৎ, নিকট আত্মীয়দেরকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। সেমতে তিনি সর্বপ্রথম সাফা পর্বতে আরোহণপূর্বক সত্য প্রচারের জন্যে পরিবারের সদস্যদেরকে একত্রিত করেন।

তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীতে বলা হয়েছে ঃ এতে বুঝা যায় যে, পরিবারের কোন সম্মানিত ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত পথে থাকে তবে তাকে বিশুদ্ধ পথে আহ্বান করা সম্মানের পরিপন্থী নয়, বরং সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার দাবী তাই। আরও জানা গেল যে, সত্যপ্রচার ও সংশোধনের কাজ নিকট আত্মীয়দের থেকে শুরু করা পয়গম্বরগণের সুন্নত।

দ্বিজাতি তত্ত্ব ঃ এ ছাড়া আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পরিবার ও সম্প্রদায়কে নিজের দিকে সম্বন্ধ করার পরিবর্তে পিতাকে বললেন ঃ তোমার সম্প্রদায় পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে। মুশরেক স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র পথে যে মহান ত্যাগ স্বীকার করেন, এ উক্তিতে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে বলে দিলেন যে, ইসলামের সম্পর্ক দ্বারাই মুসলিম জাতিয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশগত ও দেশগত জাতিয়তা যদি মুসলিম জাতিয়তার পরিপন্থী হয়, তবে মুসলিম জাতিয়তার বিপরীতে সব জাতিয়তাই বর্জনীয়।

কোরাআন পাক হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ ঘটনা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। বলা হয়েছে ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا

لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ, ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা যা করেছিলেন, তা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে উত্তম আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য। তাঁরা স্বীয় বংশগত ও দেশগত স্বজনদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা তোমাদের ও তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের থেকে মুক্ত। আমাদের ও তোমারে মধ্যে পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও শত্রুতার প্রাচীর ততদিন অবস্থিত থাকবে, যতদিন তোমরা এক আল্লাহ্‌র আরাধনায় সমবেত না হও।

বলাবাহুল্য এ দ্বিজাতি তত্ত্বই এ যুগের একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম এ মতবাদ ঘোষণা করেন। উম্মতে মুহাম্মদী ও অন্যান্য সব উম্মত নির্দেশানুযায়ী এ পন্থাই অবলম্বন করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ জাতিয়তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিদায় হজ্বের সফরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কোন্ জাতীয় লোক? উত্তর হলঃ نحن قوم مسلمون - অর্থাৎ, আমরা মুসলমান জাতি।— (বুখারী)

এতে ঐ সত্যিকার ও কালজয়ী জাতিয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা দুনিয়া থেকে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত চালু থাকবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এখানে পিতাকে সম্বোধন করার সময় স্বজনদেরকে পিতার যুক্ত করে স্বীয় অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু সেখানে জাতিকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করে বলেছেন ঃ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ --অর্থাৎ, হে আমার কওম, আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও বংশ ও দেশ হিসেবে তোমরা আমার জাতি, কিন্তু তোমাদের মুশরেকসুলভ ক্রিয়াকর্ম আমাকে তোমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য করছে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্বজন ও তদীয় পিতা দ্বিবিধ শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা প্রতিমা পূজাও করত এবং নক্ষত্র পূজাও। এ কারণেই ইব্রাহীম (আঃ) এ দু'টি প্রশ্নেই পিতা ও স্বজাতির সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

প্রথম আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রতিমা পূজা পথভ্রষ্টতা পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তারকাপুঞ্জ আরাধনার যোগ্য নয়। মাঝখানে এক আয়াতে ভূমিকাস্বরূপ আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহীমের বিশেষ মর্যাদা ও সুউচ্চ জ্ঞান-গরিমা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ

مِنَ الْمُوقِنِينَ

অর্থাৎ, আমি ইবরাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টবস্তুসমূহ প্রদর্শন করেছি, যাতে সেসব বিষয়ের স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে জেনে নেয় এবং তার বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলশ্রুতিই পরবর্তী আয়াতসমূহে একটি অভিনব বিতর্কের আকারে বর্ণিত হয়েছে।

প্রচারকার্যে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রয়োগ করা পয়গম্বরগণের সুন্নতঃ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي —অর্থাৎ, এক রাত্রিতে যখন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হল এবং একটি নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি পড়ল, তখন স্বজাতিকে শুনিয়ে বললেন ঃ এ নক্ষত্র আমার প্রতিপালক। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এটিই আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। এখন অল্পক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নেবে। কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে ইব্রাহীম (আঃ) জাতিকে জব্দ করার চমৎকার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন— لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ - آفِلِينَ —শব্দটি افول থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অস্ত যাওয়া।

উদ্দেশ্য এই যে, আমি অস্তগামী বস্তুসমূহকে ভালবাসি না। যে বস্তু খোদা কিংবা উপাস্য হবে, তার সর্বাধিক ভালবাসার পাত্র হওয়া উচিত।

এরপর অন্য কোন রাত্রিতে চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন ঃ (তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) এটি আমার পালনকর্তা। কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে উঠবে। সেমতে চন্দ্র যখন অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন বললেন ঃ যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথপ্রদর্শন না করতে থাকতেন, তবে আমিও তোমাদের মত পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্বীয় পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করে বসতাম। কিন্তু এর উদয়াস্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এ নক্ষত্রটিও আরাধনার যোগ্য নয়।

এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আমার পালনকর্তা অন্য কোন শক্তি, যার পক্ষ থেকে আমাকে সর্বক্ষণ পথপ্রদর্শন করা হয়।

এরপর একদিন সূর্য উদিত হতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে ঐভাবেই বললেন ঃ (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার প্রতিপালক এবং বৃহত্তম। কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরূপও অতি সত্বর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। সেমতে যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেন ঃ

يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ —অর্থাৎ, হে আমার জাতি, আমি তোমাদের এসব মুশরেকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত। তোমরা আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট বস্তুকেই আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করেছ।

অতঃপর এ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্টবস্তুর মধ্যে কোনটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত। বরং সেই সত্তা আমাদের সবার পালনকর্তা, যিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় আনন তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে হটিয়ে 'খোদায়ে ওয়াহদাহু লা-শরীকের' দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

এ বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আঃ) পয়গম্বরসুলভ প্রজ্ঞা ও উপদেশ প্রয়োগ করে প্রথমবারেই তাদের নক্ষত্র পূজাকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যা দেননি, বরং এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে প্রত্যেক সচেতন মানুষের মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সত্যকে উপলব্দি করে ফেলে। তবে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রথমবারেই কঠোর হয়ে যান এবং স্বীয় পিতা ও জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়টি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করে দেন। কেননা, মূর্তিপূজা যে একটি অযৌক্তিক পথভ্রষ্টতা, তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও সুবিদিত। এর বিপরীতে নক্ষত্র পূজার ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা এতটা সুস্পষ্ট ছিল না।

নক্ষত্র পূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বর্ণিত যুক্তি প্রমাণের সারমর্ম এই যে, যে বস্তু পরিবর্তনশীল, যার অবস্থা নিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে এবং স্বীয় গতিশীলতায় অন্য শক্তির অধীন, সে কিছুতেই পালনকর্তা হওয়ার যোগ্য নয়। এ যুক্তি-প্রমাণে নক্ষত্রের উদয়, অস্ত এবং মধ্যবর্তী সব অবস্থাও উল্লেখ করে বলা যেত যে, নক্ষত্র স্বীয় গতি-প্রকৃতিতে স্বাধীন নয়— অন্য কারও নির্দেশ অনুসরণ করে একটি বিশেষ পথে বিচরণ করে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) এসব অবস্থার মধ্য থেকে শুধু নক্ষত্র-পুঞ্জের অস্তমিত হওয়াকে প্রমাণে উল্লেখ করেছেন। কেননা; এগুলোর অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টিতে সেগুলির এক প্রকার পতনরূপে গণ্য হয়। যে যুক্তি-প্রমাণ জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারে, পয়গম্বরগণ সাধারণতঃ সে যুক্তি-প্রমাণই অবলম্বন করেন। তাঁরা দার্শনিকসুলভ সত্যাসত্যের পেছনে বেশী পড়েন না; বরং সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির মাপকাঠিতেই সম্বোধন করেন। তাই নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্যে অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। নতুবা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে উদয় এবং তৎপরবর্তী অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব পরিবর্তনকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেত।

প্রচারকদের জন্যে কয়েকটি নির্দেশ ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বিতর্ক-পদ্ধতি থেকে ওলামা ও ইসলাম প্রচারকদের জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অর্জিত হয়। প্রথম এই যে, প্রচার ও সংশোধনের কাজে সবক্ষেত্রে কঠোরতা সমীচীন নয় এবং সবক্ষেত্রে নম্রতাও সমীচীন নয়। বরং প্রত্যেকটির একটা বিশেষ ক্ষেত্র ও সীমা রয়েছে। প্রতিমা-পূজার ব্যাপারে ইবরাহীম (আঃ) কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। কেননা, এর ভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ বিষয়। কিন্তু নক্ষত্র পূজার ক্ষেত্রে এরূপ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেননি, বরং বিশেষ দূরদর্শিতার সাথে আসল স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। কেননা, নক্ষত্র-পুঞ্জের ক্ষমতাহীনতা স্বহস্ত-নির্মিত প্রতিমাদের ক্ষমতাহীনতার মত সুস্পষ্ট নয়। এতে বোঝা গেল যে, জনসাধারণ যদি এমন কোন ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত হয়, যার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা সাধারণ দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নয়, তবে আলেম ও প্রচারকের উচিত, কঠোরতার পরিবর্তে তাদের সন্দেহ ভঞ্জনের পন্থা অবলম্বন করা।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, সত্য প্রকাশের বেলায় এখানে ইবরাহীম (আঃ) জাতিকে একথা বলেননি যে, তোমরা এরূপ কর; বরং নিজের অবস্থা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি এসব উদয় ও অস্তের আবর্তে নিপতিত বস্তুকে উপাস্য স্থির করতে পারি না। তাই আমি স্বীয় আনন এমন সত্তার দিকে করে নিয়েছি, যিনি এসব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। উদ্দেশ্য তাই ছিল যে, তোমাদেরও এরূপ করা দরকার। কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে তিনি স্পষ্ট সম্বোধনে বিরত থাকেন— যাতে তারা জেদের বশবর্তী না হয়ে পড়ে। এতে বোঝা গেল যে, যেভাবে ইচ্ছা সত্যকথা বলে দেয়াই সংস্কারক ও প্রচারকের দায়িত্ব নয়, বরং কার্যকরী ভঙ্গীতে বলা জরুরী।

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ
وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَوَهَبْنَا
لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ
وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَ
هَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ
وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ
وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾
ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ
أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ
فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لَّا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

(৮২) যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরেকীর সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। (৮৩) এটি ছিল আমার যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (৮৪) আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং এয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ-প্রদর্শন করেছি— তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (৮৫) আরও যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৮৬) এবং ইসরাঈল, ইয়াসা, ইউনুস, লূতকে— প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। (৮৭) আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে; আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। (৮৮) এটি আল্লাহ্‌র হেদায়েত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, এপথে চালান। যদি তারা শেরেকী করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত। (৮৯) তাদেরকেই আমি গ্রন্থ, শরীয়ত ও নবুওয়ত দান করেছি। অতএব, যদি এরা আপনার নবুওয়ত অস্বীকার করে, তবে এর জন্যে এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না। (৯০) এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্ পথ-প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন ঃ আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্যে একটি উপদেশমাত্র।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ শান্তির কবল থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত তারাই হতে পারে, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর বিশ্বাসের সাথে কোনরূপ জুলমকে মিশ্রিত না করে। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম চমকে উঠেন এবং আরয করেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর কোন জুলুম করেনি? এ আয়াতে শান্তির কবল থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্যে বিশ্বাসের সাথে জুলুমকে মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় কি? মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন ঃ তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে 'জুলুম' বলে শেরককে বোঝানো হয়েছে। দেখ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ – (নিশ্চিত শিরক বিরাট জুলুম) কাজেই আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শান্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথ প্রাপ্ত।

মোটকথা এই যে, যারা প্রতিমা, প্রস্তর, বৃক্ষ, নক্ষত্র, সমুদ্র ইত্যাদির পূজা করে তারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ এগুলোকে ক্ষমতাশালী মনে করে এবং ধারণা করে, এরা হয়তো কোন ক্ষতি করে ফেলবে— এ কারণে এদের আরাধনা ত্যাগ করতে ভয় পায়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের নিগূঢ় কথা বলে দিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের ভালমন্দ সবকিছু করার ব্যাপারে সর্বশক্তিমান। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে বিপদ হবে— অথচ এ ভয় তো তোমরা কর না। পক্ষান্তরে যাদের জ্ঞানও নেই, শক্তিও নেই— তাদের পক্ষ থেকে বিপদের ভয় কর— এটা নির্বুদ্ধিতা নয় তো কি? একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় করা উচিত। যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তার কোন বিপদাশঙ্কা নেই।

এ আয়াতে وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ –বলা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী জুলুমের অর্থ শেরক– সাধারণ গোনাহ্ নয়। কিন্তু ظلم শব্দটি نكره ব্যবহার করায় আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ ব্যাপক হয়ে গেছে। অর্থাৎ, যাবতীয় শেরকই এর অন্তর্ভুক্ত। يلبسوا শব্দটি لبس থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরিধান করা কিংবা মিশ্রিত করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের সাথে কোন প্রকার শেরক মিশ্রিত করে; অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলাকে তাঁর যাবতীয় গুণসহ স্বীকার করা সত্ত্বে অন্যকেও কোন কোন ঐশী গুণের বাহক মনে করে, সে ঈমান থেকে খারিজ।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, খোলাখুলিভাবে মুশরেক ও মূর্তিপূজারী হয়ে যাওয়াই শুধু শেরক নয়, বরং সে ব্যক্তিও মুশরেক, যে কোন প্রতিমার পূজা করে না এবং ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করে; কিন্তু কোন ফেরেশতা কিংবা রসুল কিংবা ওলীকে খোদার কোন কোন বিশেষ গুণে অংশীদার মনে করে। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে যারা ওলীদেরকে এবং তাদের মাযারকে 'মনোবাঞ্ছা পূরণকারী' বলে বিশ্বাস করে এবং কার্যতঃ মনে করে যে, খোদায়ী ক্ষমতা যেন তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে, আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

আয়াতে উল্লেখিত সতের জন পয়গম্বরের তালিকায় একজন অর্থাৎ,

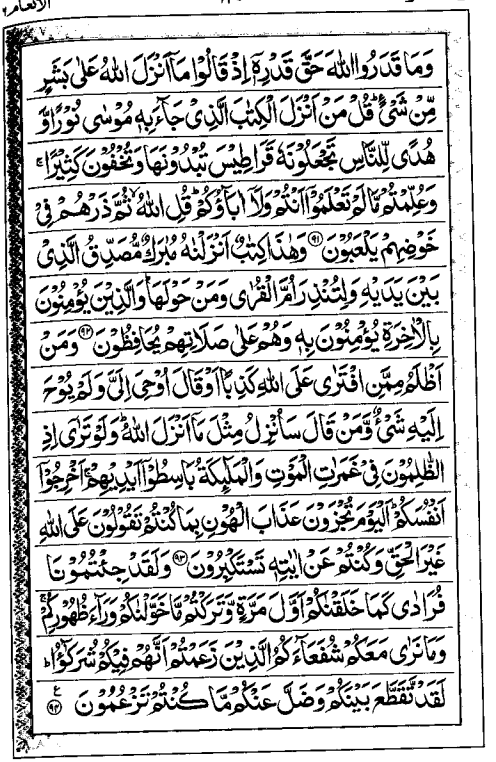

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ
مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَ
هُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ
وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي
خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ
إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ
الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا
أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا
فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ
وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ
لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

(৯১) তারা আল্লাহ্‌কে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বলল ঃ আল্লাহ্ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি। আপনি জিজ্ঞেস করুন ঃ ঐ গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মূসা নিয়ে এসেছিল? যা জ্যোতিবিশেষ এবং মানবমন্ডলীর জন্যে হেদায়েতস্বরূপ, যা তোমরা বিক্ষিপ্তপত্রে রেখে লোকদের জন্যে প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন করছ। তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতো না। আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন। (৯২) এ কোরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তীদেরকে ভয়প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা স্বীয় নামায সংরক্ষণ করে। (৯৩) ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে ঃ আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাজিল করে দেখাচ্ছি, যেমন আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে। (৯৪) তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও হয়েগেছে।

হযরত নূহ (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পূর্বপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই তাঁর সন্তান-সন্ততি। বলা হয়েছে وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ — এ আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করার কারণে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কন্যা পক্ষের সন্তান; অর্থাৎ, পৌত্র নয়— দৌহিত্র। অতএব, তাঁকে বংশধর কিরূপে বলা যায়? অধিকাংশ আলেম ও ফেকাহ্‌বিদ এর উত্তরে বলেছেন যে, ذريت শব্দটি পৌত্র ও দৌহিত্র সবাইকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা বলেন যে, হযরত হুসাইন (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বংশধর।

দ্বিতীয় আপত্তি হযরত লূত (আঃ) সম্পর্কে দেখা দেয় যে, তিনি ইব্রাহীম (আঃ)-এর সন্তানভুক্ত নন, বরং তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। এর উত্তরও সুস্পষ্ট যে, সাধারণ পরিভাষায় পিতৃব্যকে পিতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্র বলা সুবিদিত।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি খোদায়ী অবদানসমূহ বর্ণনা করে এ আইন ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ্ তাআলা তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন। অপরদিকে মক্কার মুশরেকদেরকে এসব অবস্থা শুনিয়ে বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর সমগ্র পরিবার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সত্তা। তাঁর সাথে অন্যকে আরাধনায় শরীক করা কিংবা তাঁর বিশেষ গুণে তাঁর সমতুল্য মনে করা কুফর ও পথভ্রষ্টতা। অতএব তোমরা যদি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদেশ অমান্য কর, তবে তোমরা আপন স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত।

অষ্টম আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে মহানবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ অর্থাৎ, আপনার কিছু সংখ্যক সম্বোধিত ব্যক্তি যদি আপনার কথা অমান্য করে এবং পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের নির্দেশ বর্ণনা করা সত্ত্বেও অস্বীকারই করতে থাকে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, আপনার নবুওয়ত স্বীকার করার জন্যে আমি একটি বিরাট জাতি স্থির করে রেখেছি। তারা অবিশ্বাস করবে না। মহানবী (সাঃ)-এর আমলে বিদ্যমান মুহাজির ও আনসার এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এ 'বিরাট জাতির' অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত তাঁদের সবার জন্যে গর্বের সামগ্রী। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা প্রশংসার স্থলে তাদের উল্লেখ করেছেন। اللهم اجعلنا معهم واحشرنا فى زمرتهم

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র জন্যে স্বজাতি ও স্বগোত্র পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আম্বিয়া (আঃ) - এর একটি বিরাট দল লাভ করেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁর সন্তান-সন্ততি। তিনি ইরাক ও সিরিয়া পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র ঘর, নিরাপদ শহর, উম্মুল কুরা অর্থাৎ, মক্কা লাভ করেন। তাঁর জাতি তাঁকে লাঞ্ছিত করতে চাইলে এর বিনিময়ে তিনি সমগ্র বিশ্ব এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানব জাতির ইমাম ও নেতা রূপে বরিত হন। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে একমত।

এ ক্ষেত্রে সতের জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁদের

অধিকাংশই ইবরাহীম (আঃ) এর সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে,আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে ধর্মের খেদমতের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং সৎপথ প্রদর্শন করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে মক্কাবাসীদেরকে শুনানো হয়েছে যে, কোন জাতির পূর্ব-পুরুষরা শুধু পিতৃপুরুষ হওয়ার কারণেই অনুসরণীয় হতে পারে না যে, তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে অনুসরণযোগ্য মনে করতে হবে। আরবদের সাধারণ ধারণা তাই ছিল। অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে যে, যার অনুসরণ করা হবে, সে নিজেও বিশুদ্ধ পথে আছে কি না। তাই আম্বিয়া (আঃ) —এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ- অর্থাৎ, এঁরাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। এরপর বলেছেন ঃ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ—অর্থাৎ, আপনিও তাদের হেদায়াত ও কর্মপন্থা অনুসরণ করুন।

এতে দু'টি নির্দেশ রয়েছে ঃ (এক) আরববাসী ও সমগ্র উম্মতকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পৈতৃক অনুসরণের কুসংস্কার পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

(দুই) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনিও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের পন্থা অবলম্বন করুন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আম্বিয়া (আঃ)-এর শরীয়তসমূহে শাখাগত ও আংশিক বিভিন্নতা পূর্বেও ছিল এবং ইসলামেও তাঁদের থেকে ভিন্ন অনেক বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে । এমতাবস্থায় মহানবী (সাঃ)-কে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের পথ অনুসরণের নির্দেশ দানের অর্থ কি? দ্বিতীয় আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এর উত্তর এই যে, এখানে সব শাখাগত ও আংশিক বিধি-বিধানে পূর্ববর্তী পয়গম্বদের পথ অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং ধর্মের মূলনীতি একত্ববাদ, রেসালত ও পরকালে তাদের পথ অনুসরণ করা উদ্দেশ্য। এগুলো কোন পয়গম্বরের শরীয়তেই পরিবর্তিত হয়নি। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত একই বিশ্বাস এবং একই পথ অব্যাহত রয়েছে। যেসব শাখাগত বিধানে পরিবর্তন করা হয়নি, সেগুলোতেও অভিন্ন কর্মপন্থা রয়েছে এবং যেসব বিধানের ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের কারণে ভিন্ন নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা পালিত হয়েছে।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে বিশেষ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শাখাগত ব্যাপারেও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কর্মপন্থা অনুসরণ করতেন।— (মাযহারী ইত্যাদি)

এরপর মহানবী (সাঃ)-কে বিশেষভাবে একটি ঘোষণা করতে বলা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বগণও করেছেন। ঘোষণাটি এই

قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ

—অর্থাৎ, আমি তোমাদের জীবনকে পরিপাটী করার জন্যে যেসব নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, তজ্জন্য তোমাদের কাছে কোন ফিস বা পারিশ্রমিক চাই না। তোমরা এসব নির্দেশ মেনে নিলে আমার কোন লাভ নেই এবং না মানলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশ ও শুভেচ্ছার বার্তা।" শিক্ষা ও প্রচার কার্যের জন্যে কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা সব যুগে সব পয়গম্বরের অভিন্ন রীতি ছিল। প্রচারকার্য কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় আয়াতে ঐসব লোকের জওয়াব দেয়া হয়েছে, যারা বলেছিল, আল্লাহ্ তাআলা কোন মানুষের প্রতি কখনও কোন গ্রন্থ অবতীর্ণই করেননি; গ্রন্থ ও রসূলদের ব্যাপারটি মূলতঃ ভিত্তিহীন।

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এটি মূর্তিপূজারীদের উক্তি হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। কেননা, তারা কোন গ্রন্থ ও নবীর প্রবক্তা কোন কালেই ছিল না। অন্যান্য তফসীরকারের মতে এটি ইহুদীদের উক্তি। আয়াতের বর্ণনা-পরম্পরা বাহ্যতঃ এরই সমর্থন করে। এমতাবস্থায় তাদের এ উক্তি ছিল ক্রোধ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা স্বয়ং তাদেরও ধর্মের পরিপন্থী ছিল। ইমাম বগভী (রহঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ উক্তি করেছিল, ইহুদীরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়ে তাকে ধর্মীয় পদ থেকে অপসারিত করেছিল।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলেছেন ঃ যারা এমন বাজে কথা বলেছে, তারা যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ্ তাআলাকে চিনে নি। নতুবা এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ থেকে বেরই হত না। যারা সর্ববস্থায় ঐশীগ্রন্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন ঃ -আল্লাহ্ তাআলা কোন মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তবে যে তওরাত তোমরা স্বীকার কর এবং যার কারণে তোমরা জাতির 'চৌধুরী' হয়ে বসে আছ, সে তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? আরও বলে দিন ঃ তোমরা এমন বক্রগামী যে, তোমরা যে তওরাতকে ঐশীগ্রন্থ বলে স্বীকার কর, তার সাথেও তোমাদের ব্যবহার সহজ-সরল নয়। তোমরা একে বাঁধাই করা গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছ, যাতে যখনই মন চায়, তখনই মাঝখান থেকে কোন পাতা উধাও করে দিয়ে তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করতে পার। তওরাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কিত কিছু আয়াত ছিল। ইহুদীরা সেগুলো তওরাত থেকে উধাও করে দিয়েছিলে। আয়াতের শেষে تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। قَرَاطِيسَ শব্দটি قرطاس এর বহুবচন। এর অর্থ কাগজের পাতা।

এরপর তাদেরকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ —অর্থাৎ, কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে তওরাত ও ইঞ্জীলের চাইতেও অধিক জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও জানা ছিল না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ না করে থাকলে তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর তারা কি দেবে; আপনিই বলেদিন ঃ আল্লাহ্ তাআলাই অবতীর্ণ করেছেন। যখন তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আপনার কাজও শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা যে ক্রীড়া-কৌতুকে ডুবে আছে তাতেই তাদেরকে থাকতে দিন।

তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ করার পর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا

إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ
الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ
جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ
الْعَلِيْمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ
ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٩٧﴾ وَ
هُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ
قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَّجَنّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ اُنْظُرُوْا إِلٰى ثَمَرِهٖ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ إِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ
وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٠٠﴾
بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ
صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

(৯৫) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী; তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ্, অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (৯৬) তিনি প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ। (৯৭) তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন—যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও। নিশ্চয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্যে আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি। (৯৮) তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থল। নিশ্চয় আমি প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্যে, যারা চিন্তা করে। (৯৯) তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর— যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চয় এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে। (১০০) তারা জিনদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থির করে; অথচ তাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তারা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্‌র জন্যে পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তিনি পবিত্র ও সমুন্নত, তাদের বর্ণনা থেকে। (১০১) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহ্‌র পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ।

অর্থাৎ, তওরাত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ— একথা যেমন তারাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে এ কোরআনও আমি অবতীর্ণ করেছি। কোরআনের সত্যতার জন্যে তাদের পক্ষে এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, কোরআন, তওরাত ও ইঞ্জীলে অবতীর্ণ সব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করে। তওরাত ও ইঞ্জীলের পর এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করার প্রয়োজন এ জন্যে দেখা দেয় যে, এ গ্রন্থদ্বয় বনী-ইসরাঈলের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের অপর শাখা বনী-ইসমাঈল যারা আরব নামে খ্যাত এবং উম্মুল কুরা অর্থাৎ, মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাসবাস করে, তাদের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোন বিশেষ পয়গম্বর ও গ্রন্থ এ যাবত অবতীর্ণ হয়নি। তাই এ কোরআন বিশেষভাবে তাদের জন্যে এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের জন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে। মক্কা মোয়াজ্জমাকে কোরআন পাক 'উম্মুল কুরা' বলেছে। অর্থাৎ, বস্তিসমূহের মূল। এর কারণ এই যে, ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এখান থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। এছাড়া এ স্থানটিই সারা বিশ্বের কেবলা এবং মুখ ফেরানোর কেন্দ্রবিন্দু।— (মাযহারী)

উম্মুল কুরার পর وَمَنْ حَوْلَهَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকা। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সমগ্র বিশ্ব এর অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُوْنَ

অর্থাৎ, যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা কোরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায সংরক্ষণ করে। এতে ইহুদী ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ, যা ইচ্ছা মেনে নেয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখান করা এর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র তৈরী করা— এটি পরকালে বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া। যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস করে, খোদভীতি অবশ্যই তাকে যুক্তি -প্রমাণে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং পৈতৃক প্রথার পরওয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

চিন্তা করলে দেখা যায়, পরকালের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল কারণ। কুফর ও শিরকসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি। পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোন সময় ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে এবং অবশেষে তওবা করে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে খোদাভীতি এবং পরকালভীতিই মানুষকে মানুষ করে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই কোরআন পাকের কোন সূরা বরং কোন রুকূ এমন নেই, যাতে পরকাল চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৯৫ থেকে ৮৯ এই চার আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের এ রোগের প্রতিকারার্থ স্বীয় বিস্তৃত জ্ঞান ও মহান শক্তির কয়েকটি নমুনা এবং মানুষের প্রতি নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজি উল্লেখ করেছেন। এতে সামান্য চিন্তা করলেই প্রত্যেক সুস্থ স্বভাব ব্যক্তি স্রষ্টার মাহাত্ম্য ও তাঁর অপরিসীম শক্তি-সামর্থ্য স্বীকার না করে থাকতে পারবে না। তখন সে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এ বিরাট কীর্তি আল্লাহ্ তাআলা ছাড়া আর কারও হতে পারে না। বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى অর্থাৎ, আল্লাহ্

তাআলা বীজ ও আঁটি অঙ্কুরণকারী। এতে খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যের এক বিস্ময়কর ঘটনা বিধৃত হয়েছে। শুষ্ক বীজ ও শুষ্ক আঁটি ফাঁক করে তার ভেতর থেকে শ্যামল ও সতেজ বৃক্ষ বের করে দেয়া একমাত্র জগত স্রষ্টারই কাজ— এতে কোন মানুষের চেষ্টা ও কর্মের কোন প্রভাব নেই। খোদায়ী শক্তির বলে বীজ ও আঁটির ভেতর থেকে যে নাজুক অঙ্কুর গজিয়ে উঠে, তার পথ থেকে সকল প্রতিবন্ধকতা ও ক্ষতিকর বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়াই কৃষকের সকল চেষ্টার মূল বিষয়। লাঙ্গল চষে মাটি নরম করা, সার দেয়া, পানি দেয়া ইত্যাদি কর্মের ফল এর চাইতে বেশী কিছু নয় যে, অঙ্কুরের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকে। এ ব্যাপারে আসল কাজ হচ্ছে বীজ ও আঁটি ফেটে বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হওয়া, অতঃপর তাতে রং-বেরঙের রকমারি পাতা গজানো এবং এমন ফল-ফুলে সুশোভিত হওয়া যে, মানুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক তার একটি পাতা ও পাপড়ি তৈরী করতেও অক্ষম হয়ে যায়। এটা জানা কথা যে, এতে মানব কর্মের কোন প্রভাব নেই। তাই কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ

অর্থাৎ, তোমরা কি ঐ বীজগুলোকে দেখ না যা তোমরা মাটিতে ফেলে দাও? এগুলো তোমরা বপন ও তৈরী কর না আমি করি?

দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছেঃ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলাই মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেন। মৃত বস্তু যেমন, বীর্য ও ডিম— এগুলো থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের সৃষ্টি হয়, এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু বের করে দেন— যেমন, বীর্য ও ডিম জীবিত বস্তু থেকে বের হয়।

এরপর বলেছেনঃ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ —অর্থাৎ, এগুলো সব এক আল্লাহ্র কাজ। অতঃপর একথা জেনে-শুনে তোমরা কোন দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছ? তোমরা স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমাকে বিপদ-বিদূরণকারী ও অভাব পূরণকারী উপাস্য বলতে শুরু করেছে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ - فَالِقُ শব্দের অর্থ ফাঁককারী এবং اصباح শব্দের অর্থ এখানে প্রভাতকাল। فَالِقُ الْإِصْبَاحِ -এর অর্থ প্রভাতের ফাঁককারী; অর্থাৎ, গভীর অন্ধকারের চাদর ফাঁক করে প্রভাতের উন্মেষকারী। এটিও এমন একটি কাজ, যাতে জিন, মানব ও সমগ্র সৃষ্ট জীবের শক্তিই ব্যর্থ। প্রতিটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি একথা বুঝতে বাধ্য যে, রাত্রির অন্ধকারের পর প্রভাতরশ্মির উদ্ভাবক জিন, মানব, ফেরেশতা অথবা অন্য কোন সৃষ্টজীব হতে পারে না, বরং এটি বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলারই কাজ।

সৌর ও চান্দ্র হিসাব ঃ বলা হয়েছেঃ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا حسبان একটি ধাতু। এর অর্থ হিসাব করা, গণনা করা। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়, অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীনে রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বৎসর, মাস, দিন, ঘন্টা এমনকি, মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে।

আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের গতি-বিধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতি-বিধিতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। এদের কলকব্জা মেরামতের জন্যে কোন ওয়ার্কশপের প্রয়োজন হয় না এবং যন্ত্রাংশের ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরিবর্তনের আবশ্যকতাও দেখা দেয় না। এ উজ্জ্বল গোলকদ্বয় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে বিচরণ করছেঃ

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ

পরিতাপের বিষয়, প্রকৃতির এ অটল ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা থেকেই মানুষ প্রতারিত হয়েছে। তারা এগুলোকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং উপাস্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে বসেছে। যদি এ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে অচল হয়ে যেত এবং কলকব্জা মেরামতের জন্যে কয়েক দিন বা কয়েক ঘন্টার বিরতি দেখা দিত, তবে মানুষ বুঝতে পারত যে, এসব মেশিন আপনা আপনি চলে না, বরং এগুলোর পরিচালক ও নির্মাতা আছে। ঐশীগ্রন্থ, পয়গম্বর ও রসূলগণ এ সত্য উদ্ঘাটন করার জন্যেই প্রেরিত হন।

কোরআন পাকের এ বাক্য আরও ইঙ্গিত করেছে যে, বছর ও মাসের সৌর ও চান্দ্র উভয় প্রকার হিসাবই হতে পারে এবং উভয়টি আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত। এটা ভিন্ন কথা যে, সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের সুবিধার্থ এবং তাদেরকে হিসাব-কিতাবের জটিলতা থেকে দূরে রাখার জন্যে ইসলামী বিধি-বিধানে চান্দ্র বৎসর ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু ইসলামী তারিখ এবং ইসলামী বিধান পুরোপুরিভাবে চান্দ্র হিসাবের উপর নির্ভরশীল, তাই এ হিসাবকে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখা সকল মুসলমানের অবশ্যই কর্তব্য। প্রয়োজনবশতঃ সৌর ও অন্যান্য হিসাবও ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে কোন পাপ হবে না। কিন্তু চান্দ্র হিসাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা এবং বিলোপ করে দেয়া পাপের কারণ। এতে রমযান কিংবা যিলহজ্জ ও মহররম কবে হবে তা অজ্ঞাত হয়ে যাবে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ অর্থাৎ, এ বিস্ময়কর অটল ব্যবস্থা— যাতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হয় না— একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই অপরিসীম শক্তির কারসাজি, যিনি পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সব ব্যাপারে জ্ঞানী।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ

অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রও আল্লাহ্ তাআলার অপরিসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এগুলো সৃষ্টি করার পেছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে তন্মধ্যে একটি এই যে, জল ও স্থলপথে ভ্রমণ করার সময় রাত্রির অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ এসব নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, আজ বৈজ্ঞানিক কলকব্জার যুগেও মানুষ নক্ষত্রপুঞ্জের পথ প্রদর্শনের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়।

এ আয়াতেও মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এসব নক্ষত্রও কোন একজন নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন বিচরণ করছে। এরা স্বীয় অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও কর্মে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। যারা শুধু এদের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে এবং নির্মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং আত্মপ্রবঞ্চিত।

এরপর বলেছেনঃ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ - অর্থাৎ, আমি শক্তির প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি বিজ্ঞজনদের জন্যে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা এসব সুস্পষ্ট নির্দশন দেখেও আল্লাহ্কে

চিনে না, তারা বেখবর ও অচেতন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ الَّذِيٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ – مستقر শব্দটি قرار থেকে উদ্ভুত। কোন বস্তুর অবস্থান স্থলকে مستقر বলা হয়। مستودع শব্দটি وديعت থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ কারও কাছে কোন বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রেখে দেয়া। অতএব, مستودع ঐ জায়গাকে বলা হবে, যেখানে কোন বস্তু অস্থায়ী-ভাবে কয়েক দিন রাখা হয়।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলাই সে পবিত্র সত্তা যিনি মানুষকে এক সত্তা থেকে অর্থাৎ, আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্যে একটি দীর্ঘকালীন এবং একটি স্বল্পকালীন অবস্থান-স্থল নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কোরআন পাকের ভাষা এরূপ হলেও এর ব্যাখ্যায় বহুবিধ সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে তফসীরকারদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেছেন ঃ مستقر ও مستودع যথাক্রমে মাতৃগর্ভ ও দুনিয়া। আবার কেউ বলেছেন ঃ কবর ও পরলোক। এছাড়া আরও বিভিন্ন উক্তি আছে এবং কোরআনের ভাষায় সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে। কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রঃ) তফসীরে মাযহারীতে বলেছেন ঃ مستقر হচ্ছে পরলোকের বেহেশত ও দোযখ। আর মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে পরকাল অবধি সবগুলো স্তর। তা মাতৃগর্ভই হোক কিংবা পৃথিবীতে বসবাসের জায়গাই হোক কিংবা কবর ও বরযখই হোক— সবগুলোই হচ্ছে مستودع অর্থাৎ, সাময়িক অবস্থানস্থল। কোরআন পাকের এক আয়াত দ্বারাও এ উক্তির অগ্রগণ্যতা বুঝা যায়। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ

- অর্থাৎ, তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। এর সারমর্ম এই যে, পরকালের পূর্বে মানুষ সমগ্র জীবনে একজন মুসাফিরসদৃশ। বাহ্যিক স্থিরতা ও অবস্থিতির সময়ও প্রকৃতপক্ষে সে জীবন-সফরের বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করতে থাকে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তুতে অভিনব শ্রেণীবিন্যাস নির্দেশিত হয়েছে। এখানে তিন প্রকার সৃষ্ট জগতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (এক) উর্ধ্বজগত (দুই) অধঃজগত এবং (তিন) শূন্যজগত। অর্থাৎ, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মধ্যবর্তী শূন্যজগতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ। প্রথমে অধঃজগতের বস্তু সমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ এগুলো আমাদের অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর এগুলোর বর্ণনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ (এক) মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগানের বর্ণনা এবং (দুই) মানব ও জীবজন্তুর বর্ণনা। প্রথমোক্তটি প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এটি অপরটির তুলনায় অধিক স্পষ্ট এবং অপরটি যেহেতু আত্মার উপর নির্ভরশীল, তাই কিছুটা সূক্ষ্ম। সেমতে বীর্যের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা চিকিৎসকদের অনুভূতির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কশীল। এর বিপরীতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ। এরপর শূন্যজগতের উল্লেখ করা হয়েছে ; অর্থাৎ সকাল ও বিকাল। এরপর উর্ধ্বজগতের সৃষ্ট বস্তু বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। অতঃপর অধঃজগতের বস্তুসমূহ অধিক প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে এগুলোর পূর্ণ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। তবে পূর্বে এগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখিত হয়েছিল, এবার বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনার শ্রেণীবিন্যাসে সংক্ষিপ্ত বর্ণনার শ্রেণীবিন্যাসের বিপরীত করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রাণীদের বর্ণনা অগ্রে এবং উদ্ভিদের বর্ণনা পরে। সম্ভবতঃ এর কারণ এই যে, এ বিস্তারিত বর্ণনায় নেয়ামত প্রকাশের ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তাই منعم عليه যাদের-কে নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে, তারা উদ্দিষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। উদ্ভিদের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রেণীবিন্যাস বহাল রয়েছে। অর্থাৎ, শস্যের অবস্থা, বীজ ও আঁটির বর্ণনার আগে এনে এবং একে উদ্ভিদের অনুগামী করে মাঝখানে বৃষ্টির প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। এতে আরও একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকতে পারে। তা এই যে, সূচনার দিক থেকে বৃষ্টি উর্ধ্বজগতের, পরিণতির দিক দিয়ে অধঃজগতের এবং দূরত্ব অতিক্রমের দিক দিয়ে শূন্যজগতের বস্তু।

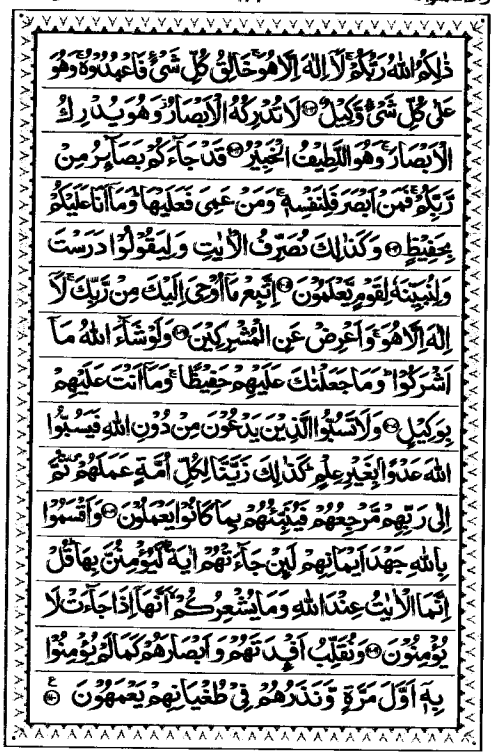

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ
الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ
رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ
وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا
إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا
اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَأَقْسَمُوا
بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ
إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا
بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾ ع

(১০২) তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী। (১০৩) দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সুবিজ্ঞ। (১০৪) তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই। (১০৫) এমনিভাবে আমি নিদর্শনাবলী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করি— যাতে তারা না বলে যে, আপনি তো পড়ে নিয়েছেন এবং যাতে আমি একে সুধীবৃন্দের জন্যে খুব পরিব্যক্ত করে দেই। (১০৬) আপনি পথ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (১০৭) যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে তারা শেরক করত না। আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক করিনি এবং আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন। (১০৮) তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যাকিছু তারা করত। (১০৯) তারা জোর দিয়ে আল্লাহ্র কসম খায় যে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে। আপনি বলে দিন ঃ নিদর্শনাবলী তো আল্লাহ্র কাছেই আছে। হে মুসলমানগণ, তোমাদেরকে কে বলল যে, যখন তাদের কাছে নিদর্শনাবলী আসবে, তখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেই? (১১০) আমি ঘুরিয়ে দিব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমন-তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দিব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে ابصار শব্দটি بصر -এর বহুবচন। এর অর্থ দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তি। ادراك শব্দের অর্থ পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এস্থলে ادراك শব্দের অর্থ বেষ্টন করা বর্ণনা করেছেন।—(বাহরে-মুহীত)

এতে আয়াতের অর্থ হয় এই যে, জিন, মানব, ফেরেশতা ও যাবতীয় জীব-জন্তুর দৃষ্টি একত্রিত হয়েও আল্লাহ্র সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র সৃষ্টজীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে দেখেন এবং সবাইকে বেষ্টন করে দেখেন। এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার দু'টি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে। (এক) সমগ্র সৃষ্ট জগতে কারও দৃষ্টি বরং সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তাঁর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ এযাবত পৃথিবীতে যত মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও শয়তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত জন্মগ্রহণ করবে, তারা সবাই যদি এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি দ্বারাও আল্লাহ্ তাআলার সত্তাকে পুরোপুরি বেষ্টন করা সম্ভবপর নয়।—(মাযহারী)

এ বিশেষ গুণটি একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই হতে পারে। নতুবা আল্লাহ্ দৃষ্টিকে এত শক্তি দিয়েছেন যে, ক্ষুদ্রতম জীবের ক্ষুদ্রতম চক্ষু পৃথিবীর বৃহত্তম মণ্ডলকে দেখতে পারে এবং চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে। সূর্য ও চন্দ্র কি বিরাট গ্রহ! এদের বিপরীতে পৃথিবীও কিছুই নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ, বরং ক্ষুদ্রতম জন্তুর চক্ষু এসব গ্রহকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে।

সত্যি বলতে কি, দৃষ্টি মানুষের একটি ইন্দ্রিয়বিশেষ। এর দ্বারা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহেরই জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা বুদ্ধি ও ধারণার বেষ্টনীরও উর্ধ্বে। দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাঁর জ্ঞান কিরূপে অর্জিত হতে পারে?

স্রষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা ঃ মানুষ আল্লাহ্ তাআলাকে দেখতে পারে কিনা, এ সম্পর্কে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস এই যে, এ জগতে এটা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই হযরত মূসা (আঃ) যখন رَبِّ أَرِنِي (হে পরওয়ারদেগার, আমাকে দেখা দাও) বলে আল্লাহ্‌কে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন উত্তরে বলা হয়েছিল ঃ لَنْ تَرَانِي (তুমি কস্মিনকালেও আমাকে দেখতে পারবে না।) হযরত মূসাই যখন এ উত্তর পেয়েছিলেন, তখন অন্য কোন জিন ও মানুষের সাধ্য কি! তবে পরকালে মু'মিনরা আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাৎ লাভ করবে। একথা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। স্বয়ং কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ — কেয়ামতের দিন অনেক মুখমণ্ডল সজীব ও প্রফুল্ল হবে। তারা স্বীয় পালনকর্তাকে দেখতে থাকবে।

তবে কাফের ও অবিশ্বাসীরা সেদিনও সাজা হিসেবে আল্লাহ্‌কে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কোরআনের এক আয়াতে আছে ঃ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ —অর্থাৎ, কাফেররা সেদিন স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

পরকালে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তাআলার সাক্ষাৎ ঘটবে— হাশরে

অবস্থানকালেও এবং জান্নাতে পৌছার পরও। জান্নাতীদের জন্যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতই হবে সর্ববৃহৎ নেয়ামত।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলনেঃ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা যেসব নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ, এগুলোর চাইতে বৃহৎ আরও কোন নেয়ামতের প্রয়োজন হলে বল, আমি তাও দেব। জান্নাতীরা নিবেদন করবেঃ ইয়া আল্লাহ্, আপনি আমাদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। এর বেশী আমরা আর কি চাইব। তখন মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ হবে। এটিই হবে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমে হযরত সোহায়ব থেকে বর্ণিত আছে।

বোখারীর এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে সাহাবীদের সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেনঃ (পরকালে) তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে এ চাঁদের ন্যায় চাক্ষুষ দেখতে পাবে।

তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে ইবনে ওমর (রাঃ)–এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা দান করবেন, তাঁদেরকে প্রতিদিন সকাল–বিকাল সাক্ষাৎ দান করবেন।

মোটকথা, এ জগতে কেউ আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না এবং পরকালে সব জান্নাতী এ নেয়ামত লাভ করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মে'রাজের রাত্রে যে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তাও প্রকৃতপক্ষে পরকালেরই সাক্ষাৎ। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী বলেনঃ আকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্থানকেই জগত বা দুনিয়া বলা হয়। আকাশের উপরে পরকালের স্থান। সেখানে পৌছে যে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাকে পার্থিব সাক্ষাৎ বলা যায় না।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, ঃ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ — আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, মানুষ আল্লাহ্ তাআলাকে দেখতেই পারে না। এমতাবস্থায় কেয়ামতে কিরূপে দেখবে? এর উত্তর এই যে, 'আল্লাহ্‌কে দেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।' আয়াতের অর্থ এটা নয়; বরং অর্থ এই যে, মানুষের দৃষ্টি তাঁর সত্তাকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে না। কারণ, তাঁর সত্তা অসীম এবং মানুষের দৃষ্টি সসীম।

কেয়ামতের দেখাও চতুর্দিক বেষ্টন করে হবে না। দুনিয়াতে এরূপ দর্শন সহ্য করার মত শক্তি মানুষের চোখে নেই। তাই দুনিয়াতে কোন অবস্থাতেই দেখা যেতে পারে না। পরকালে এ শক্তি সৃষ্টি হবে এবং দেখা ও সাক্ষাৎ হতে পারবে। কিন্তু দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র সত্তাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে দেখা তখনও হতে পারবে না।

আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় গুণ এই যে, তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টজগতকে পরিবেষ্টনকারী। জগতের অণু–কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ্ তাআলারই বৈশিষ্ট্য। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্টবস্তুর পক্ষে সমগ্র সৃষ্টজগত ও তার অণু–পরমাণুর এরূপ জ্ঞান লাভ কখনও হয়নি এবং হতে পারেও না। কেননা, এটা আল্লাহ্ তাআলারই বিশেষ গুণ।

এরপর এরশাদ হয়েছেঃ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ — আরবী অভিধানে لطيف শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ (এক) দয়ালু, (দুই) সূক্ষ্ম বস্তু যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা কিংবা জানা যায় না।

خبير শব্দের অর্থ যে খবর রাখে। বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ সূক্ষ্ম তাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁকে অনুভব করা যায় না এবং তিনি খবর রাখেন। তাই সমগ্র সৃষ্টজগতের কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর জ্ঞান ও খবরের বাইরে নয়। এখানে لطيف শব্দের অর্থ দয়ালু নেয়া হলে আলোচ্য বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজের খবর রাখেন এবং এজন্যে আমাদের গোনাহ্‌র কারণে আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দয়ালুও, তাই সব গোনাহ্‌র কারণেই পাকড়াও করেন না।

দ্বিতীয় আয়াতের بَصَائِرُ শব্দটি بصيرت —এর বহুবচন। এর অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞান। অর্থাৎ, যে শক্তি দ্বারা মানুষ অতিন্দ্রীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আয়াতে بَصَائِرُ বলে ঐসব যুক্তি–প্রমাণ ও উপায়াদিকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ সত্য ও বাস্তব রূপকে জানতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য দর্শনের উপায়–উপকরণ পৌছে গেছে। অর্থাৎ, কোরআন, রসূল (সাঃ) ও বিভিন্ন মো'জেযা আগমন করেছে এবং তোমরা রসূলের চরিত্র, কাজ–কর্ম ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করেছ। এগুলোই হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায়।

অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার করে চক্ষুষ্মান হয়ে যায়, সে নিজেরই উপকার সাধন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, সে নিজেরই ক্ষতিসাধন করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ আমি তোমাদের সংরক্ষক নই। অর্থাৎ, মানুষকে জবরদস্তিমূলকভাবে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর দায়িত্ব নয়, যেমন সংরক্ষকের দায়িত্ব হয়ে থাকে। রসূলের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পৌছে দেয়া ও বুঝিয়ে দেয়া। এরপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা না করা মানুষের দায়িত্ব।

এরপর বলা হয়েছেঃ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ –এর মর্ম এই যে, হেদায়েতের সব সাজ–সরঞ্জাম, মো'জেযা, অনুপম প্রমাণাদি— যেমন, কোরআন— একজন নিরক্ষরের মুখ দিয়ে এমন জ্ঞান–বিজ্ঞান ও সত্য প্রকাশ করা, যা ব্যক্ত করতে জগতের সব দার্শনিক পর্যন্ত অক্ষম এবং এমন অলঙ্কারপূর্ণ কালাম উচ্চারিত হওয়া, যার সমতুল্য কালাম রচনা করার জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত জিন ও মানবকে চ্যালেঞ্জ করার পরও সারা বিশ্ব অক্ষমতা প্রকাশ করেছে—সত্য দর্শনের এসব সরঞ্জাম দেখে যে কোন হটকারী অবিশ্বাসীরও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর পদতলে লুটিয়ে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান ছিল, তারা বলতে থাকে درست অর্থাৎ, এসব জ্ঞান–বিজ্ঞান আপনি কারও কাছ থেকে অধ্যয়ন করে নিয়েছেন।

সাথে সাথেই বলা হয়েছেঃ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ –এর সারমর্ম এই যে, সঠিক বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানীদের জন্যে এ বর্ণনা উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। মোটকথা এই যে, হেদায়েতের সরঞ্জাম সবার সামনেই রাখা হয়েছে। কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা এর দ্বারা উপকৃত হয়নি। পক্ষান্তরে সুস্থ জ্ঞানী মনীষীরা এর মাধ্যমে বিশ্বের পথপ্রদর্শক হয়ে গেছেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)–কে বলা হয়েছেঃ কে মানে আর কে মানে না— আপনি তা দেখবেন না। আপনি স্বয়ং ঐ পথ অনুসরণ করুন, যা অনুসরণ করার জন্যে পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ আগমন করেছে। এর প্রধান বিষয় হচ্ছে এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। এ প্রত্যাদেশ প্রচারের নির্দেশও রয়েছে। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মুশরিকদের জন্যে পরিতাপ করবেন না যে, তারা কেন

গ্রহণ করল না।

এর কারণ এই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ যদি সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা করতেন যে, সবাই মুসলমান হয়ে যাক, তবে কেউ শেরক করতে পারত না। কিন্তু তাদের দুষ্কৃতির কারণে তিনি ইচ্ছা করেননি, বরং তাদেরকে শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। তাই শাস্তির সরঞ্জামও সরবরাহ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে কিরূপে মুসলমান করতে পারেন? আপনি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন, আমি আপনাকে তাদের সংরক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি এসব কাজকর্মের জন্যে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যে আমার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন। কাজেই তাদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে আপনার উদ্বিগ্ন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মাসআলা নির্দেশিত হয়েছে যে, যে কাজ করা বৈধ নয়, সে কাজের কারণ ও উপায় হওয়াও বৈধ নয়।

ইবনে জরীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের শানে-নুযূল এই ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিতৃব্য আবু তালেব যখন অন্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শত্রুতায়, নির্যাতনে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরেক সর্দাররা মহাফাঁপরে পড়ে যায়। তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে ঃ আবু তালেবের মৃত্যু আমাদের জন্যে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তার মৃত্যুর পর আমরা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করি, তবে এটা আমাদের আত্মসম্মান ও গৌরবের পরিপন্থী হবে। লোকে বলবে ঃ আবু তালেব জীবিত থাকতে তো তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি, এখন একা পেয়ে তাকে হত্যা করেছে। কাজেই এখনও সময় আছে, চল আমরা সকলে মিলে স্বয়ং আবু তালেবের সাথেই চূড়ান্ত কথাবার্তা বলে নেই।

প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত মুসলমান জানে যে, আবু তালেব মুসলমান না হলেও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাঁর অগাধ মহব্বত ছিল। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শত্রুদের মোকাবেলায় সব সময় ঢাল হয়ে থাকতেন।

কতিপয় কোরাইশ সর্দারের পরামর্শক্রমে আবু তালেবের কাছে যাওয়ার জন্যে একটি প্রতিনিধিদল গঠন করা হল। আবু সুফিয়ান, আবু জাহল, আমর ইবনে আছ প্রমুখ সর্দার এ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের জন্যে মুত্তালিব নামক এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হল। সে আবু তালেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রতিনিধি দলকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিল।

তারা আবু তালেবকে বলল ঃ আপনি আমাদের মান্যবর এবং সর্দার। আপনি জানেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ না বলেন, তবে আমরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, যাকে ইচ্ছা, উপাস্য করবেন। আমরা কিছুই বলব না।

আবু তালেব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কাছে ডেকে বললেন ঃ এরা সমাজের সর্দার, আপনার কাছে এসেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আপনারা কি চান? তারা বলল ঃ আমাদের বাসনা, আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে মন্দ বলব না। এভাবে পারস্পরিক বিরোধের অবসান হবে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আচ্ছা, যদি আমি আপনাদের কথা মেনে নেই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবের প্রভু হয়ে যাবেন এবং অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত হয়ে যাবে?

আবু জাহল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল ঃ এরূপ বাক্য একটি নয়, আমরা দশটি উচ্চারণ করতে সম্মত। বলুন বাক্যটি কি? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। একথা শুনেতই তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আবু তালেবও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বললেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, এ কলেমা ছাড়া অন্য কোন কথা বলুন। কেননা, আপনার সম্প্রদায় এ কলেমা শুনে ঘাবড়ে গেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ চাচাজান, আমি এ কলেমা ছাড়া অন্য কোন কলেমা বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি এ কলেমা ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এভাবে তিনি কোরাইশ সর্দারদেরকে নিরাশ করে দিলেন।

এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল ঃ হয় আপনি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকেও গালি দিব এবং ঐ সত্তাকেও, আপনি নিজেকে যার রসূল বলে দাবী করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থাৎ, আপনি ঐ প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবেন না, যাদেরকে তারা উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহ্কে মন্দ বলা শুরু করবে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে।

এখানে لَا تَسُبُّوا শব্দটি سب ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গালি দেওয়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশবকালেও কোন মানুষকে বরং কোন জন্তুকেও কখনও গালি দেননি। সম্ভবতঃ কোন সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোন কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। কোরাইশ সর্দাররা এ ঘটনাকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদেরকে গালি-গালাজ করা থেকে বিরত না হলে আমরা আপনার আল্লাহ্কেও গালি-গালাজ করব।

এতে কোরআনের এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে কোন কঠোর বাক্য বলতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হচ্ছিল; যেমন বলা হয়েছে ঃ

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ .... وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ....

وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

এবং -এসব বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছিল যে, আপনি এমন করুন কিংবা এমন করবেন না। অতঃপর এ আয়াতে সম্বোধনকে রসূলুল্লাহ্ থেকে ঘুরিয়ে সাধারণ মুসলমানদের দিকে করে দিয়ে لَا تَسُبُّوا বলা হয়েছে। এতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তো কখনও কাউকে গালি দেননি। কাজেই সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে সব সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যাপারে সাবধান হয়ে যান।—(বাহ্রে-মুহীত)

এখন প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষায় প্রতিমাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এসব আয়াত রহিত নয়। অদ্যাবধি এগুলো তেলাওয়াত করা হয়।

উত্তর এই যে, কোরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বিতর্ক হিসেবে কোন সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে তা

বলা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারও মনে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয় এবং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না যে, এতে প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা কিংবা মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ–বিদ্রূপ করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট পার্থক্যটি প্রত্যেক ভাষার বিশেষ বাক–পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারে যে, কখনও কোন বিষয়ের তথ্য উদঘাটনের উদ্দেশে কোন ব্যক্তির দোষ–ত্রুটি আলোচনা করা হয়; যেমন সাধারণতঃ আদালতসমূহে এরূপ হয়ে থাকে। আদালতের সামনে প্রদত্ত এ ধরনের বিবৃতিকে জগতের কেউ এরূপ বলে না যে, অমুক অমুককে গালি দিয়েছে। এমনিভাবে ডাক্তার ও হাকীমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ বর্ণিত হয়। এগুলোই অন্যত্র ও অন্যভাবে বর্ণিত হলে গালি মনে করা হবে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশে এগুলো বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে না।

এমনিভাবে কোরআন পাক স্থানে স্থানে প্রতিমাদের অচেতন, অজ্ঞান, শক্তিহীন ও অসহায় হওয়ার কথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছে, যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে না, তাদের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতা ফুটে উঠে। বলা হয়েছে ঃ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ অর্থাৎ, প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসক উভয়ই দুর্বল। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ, তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমারা— সবাই জাহান্নামের ইন্ধন। এখানেও কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয়— পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির কুপরিণাম ব্যক্ত করাই লক্ষ্য। ফেকাহ্‌বিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, কেউ এ আয়াতটি মুশরিকদের সাথে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে পাঠ করলে এ পাঠও নিষিদ্ধ গালির অন্তর্ভুক্ত এবং না–জায়েয হবে। যেমন, মকরূহ স্থানসমূহে কোরআন তেলাওয়াত যে না–জায়েয, তা সবাই জানে। – (রূহুল–মা'আনী)

মোটকথা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর মুখে এবং কোরআন পাকে পূর্বে এরূপ কোন বাক্য উচ্চারিত হয়নি যাকে গালি বলা যায় এবং ভবিষ্যতেও উচ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। তবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে তা নিষেধ করা হয়েছে।

এ ঘটনা ও এ সম্পর্কিত কোরআনী নির্দেশ একটি বিরাট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং কতিপয় মৌলিক বিধান এ থেকে বের হয়ে এসেছে।

কোন পাপের কারণ হওয়াও পাপ ঃ উদাহরণতঃ একটি মূলনীতি এই বের হয়েছে যে, যে কাজ নিজ সত্তার দিক দিয়ে বৈধ; বরং কোন না কোন স্তরে প্রশংসনীয়ও, সে কাজ করলে যদি কোন ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশ্রুতিতে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে সে কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা, মিথ্যা উপাস্য অর্থাৎ, প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা কমপক্ষে বৈধ অবশ্যই এবং ঈমানী মর্যাদাবোধের দিক দিয়ে দেখলে সম্ভবতঃ নিজ সত্তায় ছওয়াব ও প্রশংসনীয়ও বটে, কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে আশঙ্কা দেখা দেয় যে, প্রতিমাপূজারীরা আল্লাহ্ তাআলাকে মন্দ বলবে। অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবে, সে এ মন্দের কারণ হয়ে যাবে। তাই এ বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হাদীসে এর আরও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত রয়েছে। একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)–কে বললেন ঃ জাহেলিয়াত যুগে এক দুর্ঘটনায় কাবাগৃহ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কোরাইশরা তার পুনর্নির্মাণ করে। এ পুনর্নির্মাণে কয়েকটি বিষয় প্রাচীন ইবরাহীম ভিত্তির খেলাফ হয়ে গেছে। প্রথমতঃ কা'বার যে অংশকে 'হাতীম' বলা হয়, তাও কা'বাগৃহের অংশবিশেষ ছিল। কিন্তু পুনর্নির্মাণে অর্থাভাবের কারণে সে অংশ বাদ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কা'বা গৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টি দরজা ছিল। একটি প্রবেশের এবং অপরটি প্রস্থানের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। জাহেলিয়াত যুগের নির্মাতারা পশ্চিম দরজা বন্ধ করে একটি মাত্র দরজা রেখেছে। এটিও ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চে স্থাপন করেছে যাতে কেউ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কা'বা গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বললেন ঃ আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ইবরাহীম (আঃ)–এর নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ, আরব জাতি নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে। কা'বা গৃহ বিধ্বস্ত করলে তাদের মনে বিরূপ সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই আমি আমার বাসনা মুলতবী রেখেছি।

এটা জানা কথা যে, কা'বা গৃহকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ নির্মাণ করা একটি এবাদত ও সওয়াবের কাজ ছিল। কিন্তু জনগণের অজ্ঞতার কারণে এতে আশঙ্কা আঁচ করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এ ঘটনা থেকেও এ মূলনীতিই জানা গেল যে, কোন বৈধ বরং সওয়াবের কাজেও যদি কোন অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে সে বৈধ কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এতে রূহুল মা'আনী গ্রন্থে আবু মনসুর কর্তৃক একটি আপত্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের উপর জেহাদ ও কাফের নিধন ফরয করেছেন। অথচ কাফের নিধনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল এই যে, কোন মুসলমান কোন কাফেরকে হত্যা করলে কাফেররাও মুসলমানদেরকে হত্যা করবে। অথচ মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। এখানে জেহাদ মুসলমান হত্যার কারণ হয়েছে। অতএব, উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জেহাদও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এমনিভাবে আমাদের প্রচারকার্য, কোরআন তেলওয়াত, আযান ও নামাযের প্রতি অনেক কাফের ব্যঙ্গ–বিদ্রূপ করে। অতএব, আমরা কি তাদের এ ভ্রান্ত কর্মের দরুন নিজ এবাদত থেকেও হাত গুটিয়ে নেব?

এর জওয়াবও স্বয়ং আবু মনসূর থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি জরুরী শর্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে এ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। শর্তটি এই যে, ফ্যাসাদ অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণে যে বৈধ কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়, তা ইসলামের উদ্দিষ্ট ও জরুরী কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া চাই। যেমন, মিথ্যা উপাস্যদেরকে মন্দ বলা। এর সাথে ইসলামের কোন উদ্দেশ্য সম্পর্কযুক্ত নয়। এমনিভাবে কা'বা গৃহের নির্মাণকে ইররাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করার উপরও ইসলামের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল নয়। তাই এগুলোর কারণে যখন কোন ধর্মীয় অনিষ্টের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তখন এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কাজ স্বয়ং ইসলামের উদ্দেশ্য কিংবা কোন ইসলামী উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভরশীল, যদি বিধর্মীদের ভ্রান্ত আচরণের কারণে তাতে কোন অনিষ্টও দেখা দেয়, তবুও এ জাতীয় উদ্দেশ্যকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হবে না। বরং এরূপ কাজ স্বস্থানে অব্যাহত রেখে যতদূর সম্ভব অনিষ্টের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

এ কারণেই একবার হযরত হাসান বসরী ও মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহঃ) উভয়েই এক জানাযার নামাযে যোগদানের উদ্দেশে রওয়ানা হন। নিকটে পৌঁছে দেখলেন, সেখানে পুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদেরও সমাবেশ হয়েছে। এ অবস্থা দেখে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন সেখান থেকেই ফিরে গেলেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বললেন ঃ জনসাধারণের

ভ্রান্ত কর্ম-পন্থার কারণে আমরা জরুরী কাজ কিরূপে ত্যাগ করতে পারি? জানাযার নামায ফরয। উপস্থিত অনিষ্টের কারণে তা ত্যাগ করা যায় না। তবে অনিষ্ট দূরীকরণের জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হবে।

এ ঘটনাটিও রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে উদ্ভূত মূলনীতির সারমর্ম এই যে, যে কাজ নিজ সত্তায় বৈধ বরং এবাদত, কিন্তু শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, যদি তা করলে ফ্যাসাদ বা অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তবে তা বর্জন করা ওয়াজেব। পক্ষান্তরে কাজটি শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হলে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী হওয়ার কারণেও তা বর্জন করা যাবে না।

এ মূলনীতি অনুসরণ করে ফেকাহ্‌বিদগণ হাজারো বিধান ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন ঃ পিতা যদি অবাধ্য পুত্র সম্পর্কে একথা জানেন যে, তাকে কোন কাজ করতে বললে অস্বীকার করবে এবং বিরুদ্ধাচরণ করবে যদ্দরুন তার কঠোর গোনাহ্‌গার হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে, তবে পিতার উচিত আদেশের ভঙ্গিতে কাজটি করতে বা না করতে বলার পরিবর্তে উপদেশের ভঙ্গিতে এভাবে বলবেন ঃ অমুক কাজটি করলে খুবই ভাল হত। এভাবে অস্বীকার অথবা বিরুদ্ধাচরণ করলেও একটি নতুন অবাধ্যতার গোনাহ্ পুত্রের উপর বর্তাবে না। —(খোলাছাতুল ফাতাওয়া)

এমনিভাবে কাউকে উপদেশ দানের ক্ষেত্রেও যদি লক্ষণাদি দৃষ্টে জানা যায় যে, সে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কোন কুকাণ্ড করে বসবে, যদ্দরুন আরও অধিকতর গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তবে তাকে উপদেশ প্রদান না করাই উত্তম। ইমাম বোখারী স্বীয় হাদীস গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন ঃ

باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس فيقعوا فى اشد منه

অর্থাৎ, মাঝে মাঝে বৈধ বরং উত্তম কাজও এজন্যে পরিত্যাগ করা হয় যে, তাতে স্বল্পবুদ্ধি জনগণের কোন ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে শর্ত এই যে, কাজটি ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া চাই।

কিন্তু যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত– ফরয, ওয়াজেব, সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ অথবা অন্য কোন প্রকার ইসলামী বৈশিষ্ট্য হবে তা করলে যদিও কিছু স্বল্পজ্ঞানী লোক ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়, তবু এ কাজ কখনও ত্যাগ করা যাবে না। বরং অন্য পন্থায় তাদের ভুল বোঝাবুঝির ও ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, নামায, কোরআন তেলাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের কারণে কাফেররা উত্তেজিত হয়ে উঠত, কিন্তু এ কারণে এসব ইসলামী বৈশিষ্ট্য কখনও ত্যাগ করা হয়নি। স্বয়ং আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূলে বর্ণিত আবু জাহল প্রমুখের ঘটনার সারমর্ম তাই ছিল যে, কোরাইশ সর্দাররা তওহীদ প্রচার ত্যাগ করার শর্তে সন্ধি স্থাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন যে, তারা যদি চন্দ্র ও সূর্য এনে আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি তওহীদ প্রচার ত্যাগ করতে পারি না।

তাই এ মাসআলাটি এভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত, যদি তা করলে কিছু লোক ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়, তবুও তা কখনও ত্যাগ করা যাবে না। অবশ্য যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং যা ত্যাগ করলে কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না, এ ধরনের কাজ অপরের ভুল বোঝাবুঝি অথবা ভ্রান্তির আশঙ্কার কারণে পরিত্যাগ করা উচিত।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সুস্পষ্ট মো'জেযা ও আল্লাহ্ তাআলার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখা সত্ত্বেও হঠকারী লোকেরা সেগুলো দ্বারা উপকৃত হয়নি এবং স্বীয় অস্বীকার ও জেদে অটল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, তারা স্বীয় জেদ ও নতুন সংস্করণ রচনা করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর কাছে বিশেষ বিশেষ ধরনের মো'জেযা দাবী করেছে। যেমন, ইবনে জরীরের বর্ণনা অনুযায়ী কোরাইশ সর্দাররা দাবী উত্থাপন করেছে যে, আপনি যদি সাফা পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত হওয়ার মো'জেযা আমাদেরকে দেখাতে পারেন, তবে আমরা আপনার নবুওয়ত মেনে নেব এবং মুসলমান হয়ে যাব।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আচ্ছা, শপথ কর, যদি এ মো'জেযা প্রকাশ পায়, তবে তোমরা মুসলমান হয়ে যাবে। তারা শপথ করল। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করার জন্যে দাঁড়ালেন যে, এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল প্রত্যাদেশ নিয়ে এলেন যে, আপনি চাইলে আমি এক্ষুণি এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেব। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইনানুযায়ী এর পরিণাম হবে এই যে, এরপরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে ব্যাপক আযাব নাযিল করে সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। বিগত সম্প্রদায়সমূহের বেলায়ও তাই হয়েছে। তারা বিশেষ কোন মো'জেযা দাবী করার পর তা দেখানো হয়েছে। এরপরও যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব নাযিল হয়েছে। দয়ার সাগর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কাফেরদের অভ্যাস ও হঠকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই দয়াপরবশ হয়ে বললেন ঃ এখন আমি এ মো'জেযার দোয়া করি না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ এতে কাফেরদের উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা প্রার্থিত মো'জেযা প্রকাশিত হলে মুসলমান হওয়ার জন্যে শপথ করল। এর পরবর্তী إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ আয়াতে তাদের উক্তির জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, মো'জেযা ও নিদর্শন সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। যেসব মো'জেযা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও তাঁর পক্ষ থেকেই ছিল এবং যেসব মো'জেযা দাবী করা হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ করতেও তিনি পূর্ণরূপে সক্ষম। কিন্তু বিবেক ও ইনসাফের দিক দিয়ে তাদের এরূপ দাবী করার কোন অধিকার নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রেসালতের দাবীদার এবং এ দাবীর পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য মো'জেযা আকারে উপস্থিত করেছেন। এখন এসব যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য খণ্ডন করার এবং ভ্রান্ত প্রমাণিত করার অধিকার প্রতিপক্ষের আছে। কিন্তু এসব সাক্ষ্য খণ্ডন না করে অন্য সাক্ষ্য দাবী করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যেমন, আদালতে কোন বিবাদী বাদীর উপস্থিত করা সাক্ষীদের অযোগ্যতা প্রমাণ না করেই দাবী করে বসে যে, আমি এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য মানি না। অমুক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলে তা মেনে নেব। বাদীর এ উদ্ভট দাবীর প্রতি কোন আদালতই কর্ণপাত করবে না।

এমনিভাবে নবুওয়ত ও রেসালতের পক্ষে অসংখ্য নিদর্শন ও মো'জেযা প্রকাশিত হওয়ার পর এগুলো খণ্ডন না করা পর্যন্ত তাদের এরূপ বলার অধিকার নেই যে, আমরা তো অমুক ধরনের মো'জেযা দেখেই বিশ্বাস স্থাপন করব।

এরপর শেষ অবধি আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে আদেশ করা হয়েছে যে, নিজে সত্য ধর্মে কায়েম থাকা এবং অপরের কাছে তা শুদ্ধরূপে পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে তোমাদের দায়িত্ব। এরপরও যদি তারা হঠকারিতা করে, তবে তাদের চিন্তায় মাথা ঘামানো উচিত নয়। কেননা, জোর-জবরদস্তি করে কাউকে মুসলমান করা উদ্দেশ্য নয়। যদি তা উদ্দেশ্য হত, তবে তা করিতে আল্লাহ্‌র চাইতে শক্তিশালী কে? তিনি নিজেই সবাইকে মুসলমান করে দিতেন। এসব আয়াতে মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দান করার জন্যে আরও বলা হয়েছে যে, আমি যদি তাদের প্রার্থিত

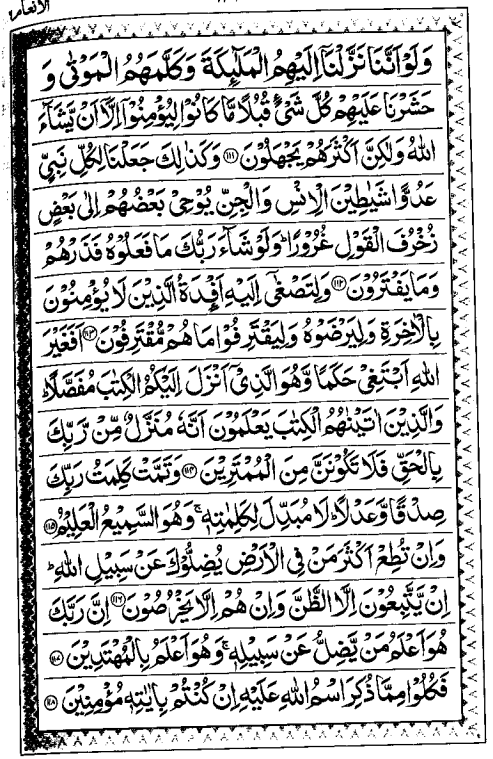

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَ
حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ
اللّٰهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿١١١﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ
عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ
زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ۗ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ
وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغٰٓى إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ أَفَغَيْرَ
اللّٰهِ أَبْتَغِىْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِىْٓ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۗ
وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
صِدْقًا وَّعَدْلًا ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾
وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِى الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ
إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٧﴾
فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾

(১১১) আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে অবতারণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নয় ; কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (১১২) এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। (১১৩) অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যাপবাদকে মুক্ত ছেড়ে দিন যাতে কারুকার্যখচিত বাক্যের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয় যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং তারা একেও পছন্দ করে নেয় এবং যাতে ঐসব কাজ করে, যা তারা করছে। (১১৪) তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (১১৫) আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (১১৬) আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে। (১১৭) আপনার প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যারা তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয় এবং তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তাঁর পথে অনুগমন করে। (১১৮) অতঃপর যে জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয়, তা থেকে ভক্ষণ কর যদি তোমরা তাঁর বিধানসমূহে বিশ্বাসী হও।

মো'জেযাসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেই, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তাদের অস্বীকৃতি কোন ভুল বোঝাবুঝি ও অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং জেদ ও হঠকারিতার কারণে। কোন মো'জেযা দ্বারা এর প্রতিকার হবার নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে যে, যদি আমি তাদের প্রার্থিত মো'জেযাসমূহ দেখিয়ে দেই ; বরং এর চাইতেও বেশী– ফেরেশতাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ এবং মৃতদের সাথে বাক্যালাপ করিয়ে দেই, তবুও তারা মানবে না। পরবর্তী দু'আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এরা যদি আপনার সাথে শত্রুতা করে, তবে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরেরও অব্যাহতভাবে শত্রু ছিল। অতএব, আপনি এতে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।

أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِىْ حَكَمًا —অর্থাৎ, তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ্ তাআলার এ ফয়সালার পর আমি অন্য কোন ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি? না, তা হতে পারে না। এরপর কোরআন পাকের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো স্বয়ং কোরআনের সত্যতা এবং আল্লাহ্র কালাম হওয়ারই প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ الَّذِىْٓ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا এ আয়াতে কোরআন পাকের চারটি বিশেষ পূর্ণতার কথা বর্ণিত হয়েছে ঃ (এক) কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (দুই) এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অলৌকিক গ্রন্থ–এর মোকাবেলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম। (তিন) যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়বস্তু এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। (চার) পূর্ববর্তী আহ্লে কিতাব ইহুদী ও খ্রীষ্টানরাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, কোরআন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য কালাম। এরপর তাদের মধ্যে যারা সত্যভাষী ছিল, তারা একথা প্রকাশও করেছে। পক্ষান্তরে যারা হঠকারী, তারা বিশ্বাস সত্ত্বেও তা প্রকাশ করেনি।

কোরআন পাকের এ চারটি পূর্ণতা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে ঃ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ অর্থাৎ ''এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের পর আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।'' এটা জানা কথা যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন সময়ই সংশয়কারী ছিলেন না, থাকতে পারেন না; যেমন স্বয়ং তিনি বলেন ঃ আমি কোন সময় সন্দেহ করিনি এবং প্রশ্ন করিনি —(ইবনে-কাসীর)। এতে বোঝা গেল যে, এখানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য লোকদের শোনানোই এর উদ্দেশ্য। এছাড়া বিষয়টিকে জোরদার করার উদ্দেশে সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কেই যখন এরূপ বলা হয়েছে, এখন অন্য আর কে সন্দেহ করতে পারে?

দ্বিতীয় আয়াতে কোরআন পাকের আরও দু'টি বৈশিষ্ট্যমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোও কোরআন পাক যে আল্লাহ্র কালাম, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা হয়েছে ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তার কালাম সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ। তাঁর কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই।

وَتَمَّتْ শব্দে সম্পূর্ণ হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং كَلِمَتُ رَبِّكَ বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। —(বাহরে-মুহীত)। কোরআনের গোটা বিষয়বস্তু দু'প্রকার, (এক) যাতে বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, অবস্থা, সৎকাজের জন্যে পুরস্কারের ওয়াদা এবং অসৎ কাজের জন্যে শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং (দুই) যাতে মানব জাতির কল্যাণ ও সাফল্যের বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোরআন পাকের এ দুই প্রকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে صِدْقًا وَّعَدْلًا দুই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। صدق –এর সম্পর্ক প্রথম প্রকারের সাথে ; অর্থাৎ, কোরআনে যেসব ঘটনা, অবস্থা, ওয়াদা ও ভীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। এগুলোতে কোনরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। عدل এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, বিধানের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলার সব বিধান عدل তথা ন্যায়বিচার ভিত্তিক। عدل শব্দের দুটি অর্থ ঃ (এক) ইনসাফ, যাতে কারও প্রতি অবিচার ও অধিকার হরণ করা হয় না। (দুই) সমতা ও সুষমতা। অর্থাৎ, আল্লাহ্র বিধান সম্পূর্ণরূপে মানবিক প্রবৃত্তির অনুসারীও নয় এবং এমনও নয় যে, মানবিক প্রেরণা ও স্বভাবগত ধারণ ক্ষমতা তা সহ্য করতে পারে না। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, খোদায়ী বিধান সুবিচার ও সমতার উপর ভিত্তিশীল। এতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং এমন কোন কঠোরতাও নেই যা মানুষ সহ্য করতে পারে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে কারো প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি। আলোচ্য আয়াতে تمت শব্দ ব্যবহার করে আরও বলা হয়েছে যে, কোরআনে শুধু صدق ও وعدل বিদ্যমানই নয়, বরং কোরআন এসব গুণে সব দিক দিয়ে পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কোরআন পাকের যাবতীয় বিধান বিশ্বের সকল জাতি, কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধর এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্যে সুবিচার ও সমতাভিত্তিক। একথাটি একমাত্র আল্লাহ্ রচিত বিধানের মধ্যেই থাকা সম্ভবপর হতে পারে। জগতের কোন আইনসভা বর্তমান ও ভবিষ্যত সকল অবস্থা পুরোপুরি অনুমান করে তদনুযায়ী কোন আইন রচনা করতে পারে না। প্রত্যেক দেশ ও জাতি নিজ দেশ ও জাতির শুধু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আইন রচনা করে। এসব আইনের মধ্যেও অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার পর সুবিচার ও সমতার পরিপন্থী দেখা গেলে সেগুলো পরিবর্তন করতে হয়। ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক অবস্থার জন্যে সুবিচার ও সমতাভিত্তিক আইন রচনা করার বিষয়টি মানুষের চিন্তা-কল্পনারও অনেক উর্ধ্বে। এটা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার কালামেই সম্ভবপর। তাই কোরআন পাকের এ পঞ্চম অবস্থাটি (অর্থাৎ, কোরআনে বর্ণিত অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, পুরস্কারের ওয়াদা ও শাস্তির ভীতি- প্রদর্শন সবই সত্য; এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কোরআন বর্ণিত যাবতীয় বিধান সমগ্র বিশ্ব ও কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদের জন্যে সুবিচার ও সমতাভিত্তিক, এগুলোতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং সমতা ও মধ্যবর্তিতার চুল পরিমাণ লঙ্ঘন নেই।) কোরআন যে আল্লাহ্র কালাম – তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কোরআনের ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ অর্থাৎ, আল্লাহ্র কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই। পরিবর্তনের এক প্রকার হচ্ছে যে, এতে কোন ভুল প্রমাণিত করার কারণে পরিবর্তন করা এবং দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে জবরদস্তিমূলকভাবে পরিবর্তন করা। আল্লাহ্র কালাম এ সকল প্রকার পরিবর্তনেরই উর্ধ্বে। আল্লাহ্ স্বয়ং ওয়াদা করেছেনঃ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ অর্থাৎ, আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। এমতাবস্থায় কার সাধ্য আছে যে, এ রক্ষাব্যূহ ভেদ করে এতে পরিবর্তন করে? কোরআনের উপর দিয়ে চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রতি শতাব্দী ও প্রতি যুগে এর শত্রুদের সংখ্যাও এর অনুসারীদের তুলনায় বেশী ছিল ; কিন্তু এর একটি যের ও যবর পরিবর্তন করার সাধ্যই কারো হয়নি। অবশ্য একটি তৃতীয় প্রকার পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। তা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা কোরআনকে রহিত করে পরিবর্তন করতে পারতেন। একারণেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বশেষ পয়গম্বর এবং কোরআন সর্বশেষ গ্রন্থ। একে রহিতকরণের আর কোন সম্ভাবনা নেই। কোরআনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ, তারা যেসব কথাবার্তা বলছে, আল্লাহ্ সব শোনেন এবং সবার অবস্থা জানেন। তিনি প্রত্যেকের কার্যের প্রতিফল দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে অবহিত করেছেন যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট। আপনি এতে ভীত হবেন না এবং তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। কোরআন একাধিক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ অন্যত্র বলা হয়েছেঃ وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ উদ্দেশ্য এই যে, সংখ্যাধিক্যের ভীতি স্বভাবতই মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ফলে মানুষ তাদের আনুগত্য করতে থাকে। কাজেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলা হয়েছেঃ

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যে, আপনি যদি তাদের নির্দেশ মান্য করেন, তবে তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে। কেননা, তারা বিশ্বাস ও মতবাদে শুধুমাত্র কল্পনা ও কুসংস্কারের পেছনে চলে এবং বিধি-বিধানে একমাত্র ভিত্তিহীন অনুমান দ্বারা চালিত হয়।

মোটকথা, আপনি তাদের সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে তাদের সাথে একাত্মতার কথা চিন্তাও করবেন না। কারণ, এরা সবাই নীতিহীন ও বিপথগামী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্র পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়ে যায় এবং যারা আল্লাহ্র পথে চলে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা তাদের সবাইকে জানেন। অতএব, তিনি বিপথগামীদেরকে যেমন শাস্তি দেবেন, তেমনি সরল পথের অনুসারীদেরকেও পুরস্কৃত করবেন।

وَمِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এ বাক্যে ইচ্ছাধীন যবেহ ও নিরুপায় অবস্থার যবেহ্— উভয় প্রকার যবেহকেই বোঝানো হয়েছে। নিরুপায় অবস্থার যবেহ হচ্ছে তীর, বাজপক্ষী ও কুকুরের শিকার করা জন্তু। এগুলো ছাড়ার সময় বিছমিল্লাহ্ পাঠ করলে এদের শিকার করা জন্তু জীবিত না পাওয়া গেলেও তাকে যবেহ করা জন্তু বলেই মনে করতে হবে। অবশ্য জীবিত পাওয়া গেলে ইচ্ছাধীনভাবে যবেহ্ করতে হবে। যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণও দুই প্রকারে হতে পারে— (এক) সত্যিকার উচ্চারণ এবং (দুই)— অসত্যিকার ও নির্দেশগত উচ্চারণ। যেমন, মুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক ভুলক্রমে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করে যবেহ করা। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে ভুলক্রমে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করলেও তা উপরোক্ত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং হালাল হবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্চারণ না করলে হারাম হবে।